কিশোর কাহিনী

• দ্রুত পঠন •

নব প্রবর্তিত সিলেবাস অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণীর সহায়ক পাঠের
পাঠক্রম অনুসারে লিখিত।

কিশোর-কাহিনী

[পঞ্চম শ্রেণীর দ্রুত-পঠন]

* স্বদেশের বরেণ্য মানুষদের ছেলেবেলার গল্প *

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এম্. এ, পি-এইচ্. ডি.
প্রধান অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
জয়পুরিয়া কলেজ, (নৈশ বিভাগ), কলিকাতা

[আমূল সংশোধিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ]
অক্টোবর, ১৯৮৩

এস্ ব্যানার্জি এণ্ড কোং ∴ বামা পুস্তকালয়
৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট • কলিকাতা ৯ — ১১এ কলেজ স্কোয়ার • কলিকাতা ১২

প্রকাশক :
শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রাপ্তিস্থান :

বামা পুস্তকালয়
১১-এ, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-৭৩

অরিয়েন্টাল বুক ডিপো
জলপাইগুড়ি

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর

মূল্য— টাঃ ৬.৫০

মুদ্রাকর :
শ্রীমুরারিমোহন কর
এম. বি. এস. প্রিণ্টার্স
৬৭-বি/১, রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৫

G. C. Bhattacharyya M. Ed. (Melbourne)
PRINCIPAL B. T. (S.T.T.) COLLEGE
(Agartala Teachers Training College).

COLLEGE TILLA
AGARTALA.
Tripura, India.

Date—3. 11. 73

আজ যে শিশু, কাল সে নাগরিক; জাতির হয়তো বা কর্ণধার। যাঁরা জাতির কর্ণধার হয়েছিলেন অতীতে তাঁদের শৈশব তাঁরা কেমন করে কাটিয়েছেন, এটা জানার কৌতূহল প্রতিটি শিশুর মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক।

জাতীয় ঐতিহ্য বলতে যা বুঝি, মূল্য-বোধ বলে আমরা যা অনুভব করি, তার কিন্তু পত্তন হয় প্রতিটি শিশুর শৈশবেই। আর এই ঐতিহ্য ও মূল্য-বোধ জাগাবার প্রশস্ত উপায় হল জাতির যাঁরা দিকপাল ছিলেন তাঁদের আদর্শ শিশুদের কাছে তুলে ধরা। বিমূর্ত আদর্শ মূর্ত হয় জাতির ঐতিহাসিক পুরুষদের জীবনে এবং তাঁদের শৈশবকালটি শিশু-চিত্তকে আকৃষ্ট করে সব চাইতে বেশী।

বাংলা সাহিত্যে শিশুদের জন্য লেখা এরূপ বই খুবই বিরল। শ্রীমান বুদ্ধদেবের 'কিশোর-কাহিনী' সে অভাব অনেকটা মেটাতে পারবে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। বিশেষ করে বইটির ভাব ও ভাষা ছোট বালক-বালিকাদের পক্ষে উপযোগী হয়েছে বলে আমি প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণকে 'কিশোর-কাহিনী'টি অবশ্য পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করতে অনুরোধ করি। ইতি—

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

॥ নিবেদন ॥

'কিশোর কাহিনীর' ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় এ-গ্রন্থের লেখক অভিভূত। স্বদেশের বরেণ্য মানুষদের ছেলেবেলার গল্প অনেককেই খুশি করতে পেরেছে, এটা খুবই আশার কথা। এই নতুন সংস্করণে বইটি আমূল পরিমার্জিত ও পরিশোধিত। একটি 'কাহিনী' বর্জিত হল ; নতুন একটি যুক্ত। এছাড়া, ছেলেমেয়েদের সুবিধার জন্য প্রতিটি কাহিনীর শেষে মূল কাহিনীতে বর্ণিত স্মরণীয় মানুষের জীবন কথা খুব সংক্ষেপে উপস্থাপিত। এগুলো অতিরিক্ত অংশ, মূল পাঠ্যের অন্তর্গত নয়।

কৌতূহলী ছেলেমেয়েরা এদের থেকে বরেণ্য মানুষদের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে। প্রয়োজনবোধে অভিভাবক ও শিক্ষকরাও এ-ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতে পারেন।

আশা করি, সংশোধিত এই 'কিশোর কাহিনী' সংশ্লিষ্ট সকলের আনুকূল্য লাভ করবে। পরিশেষে নিবেদন, বইটির সংস্কারে শুভাকাঙ্ক্ষীরা ঠিক আগের মতোই পরামর্শাদি দান করলে বাধিত হবো। ইতি—

মহালয়া
৬.১০.৮৩

নিবেদক,
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

অগ্রজপ্রতিমেষু

॥ সূচীপত্র ॥



বড় ভুলো সে। কেমন যেন বোকা-হাবা গোছের। কোনো-দিকে খেয়াল নেই, কোনো কাজে মন নেই। সব সময় কেমন যেন উদাস ভাব। খেলাধূলার সময় অনেকে তো তাকে হাবা মেয়েই বলে। মা-বাবার পর্যন্ত দুশ্চিন্তা। মেয়েটার কী যে গতি হবে! মুহূর্ত আগেও কী করেছে বা কী বলেছে তা ওর মনে থাকে না।

কখনও আবার চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় সে। বিড়-বিড় করে কী যেন বলে। বুঝি কথাবার্তা। গাছপালার সঙ্গে কখনও, আবার কখনও বা অদৃশ্য কোনো কিছুর সঙ্গে।

একদিন। মা মোক্ষদাসুন্দরী ডাকেন,—নির্মলা! বলি ও নির্মলা!

—কী মা? নির্মলা এসে উদাসভাবে মায়ের দিকে তাকায়।

—পাথরের এই বাটি-টা ধুয়ে নিয়ে আয়তো! হ্যাঁ, যদি পারিস-তো ভেঙ্গে আনিস যেন! যা কাজের তুই!

নির্মলা বাটি হাতে নিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে এগোয়। যেতে যেতে চোখে পড়ে গাছ-গাছালি, লতা-পাতা। ব্যাস, সব ভুলে যায় সে; অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। গাছপালার সঙ্গে শুরু করে কথাবার্তা। যেন কতকালের পরিচিত সব! কত আপনজন!

এদিকে কথা বলতে বলতে বাটিটা যায় ভেঙ্গে। নির্মলার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, ভাঙ্গা বাটি নিয়ে যাওয়ার কথা; মা তো বলেই দিয়েছেন, যদি পারিস তো ভেঙ্গে আনিস।

নির্মলা এবার ভাঙ্গা বাটির টুকরোগুলো কুড়িয়ে নেয়। মোক্ষদাসুন্দরীর সামনে এসে বলে,—মা, এনেছি।

—কী এনেছিস?

—ভাঙা বাটি। কুড়িয়ে এনেছি মা। তুমি তাই তো বলেছিলে।

ব্যাপার দেখে মায়ের তো চোখ ওঠে কপালে। বলেন,—হায় আমার ভাগ্যি! মেয়ের বুদ্ধি দেখ!

মেয়ে তখনও কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি।

ওদিকে মা বলেন,—আজ বৃহস্পতিবার। সবে লক্ষ্মীপূজা হল। যাও, মা-লক্ষ্মীকে প্রণাম করো গিয়ে। ঠাকুরকে বলো, তোমার মঙ্গল করতে।

নির্মলা ঠাকুর-প্রণাম করতে গিয়ে কেমন যেন হয়ে গেল। ভাবের বশে সম্পূর্ণ দিশাহারা একেবারে। নিজের ভালো না চেয়ে ঠাকুরকে সে বললো,—তোমার যা'তে আনন্দ হয় তা'ই করো ঠাকুর!

কী আশ্চর্য! ঠাকুরেরও কত যে লীলা তাকে নিয়ে! স্কুলে সে প্রায় যায়নি বললেই চলে। অথচ অ আ ক খ শেখে সে একদিনে। পড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সব লিখে ফেলে।

বই পড়ত না সে মোটেই। অথচ মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়া দেবার সময় সব ঠিক ঠিক হয়ে যেত।

অনেকদিন পর নির্মলা এসেছে স্কুলে। সেদিন আবার স্কুল-ইন্সপেক্টারও এসেছেন। অন্যসব মেয়েকে বাদ দিয়ে নির্মলাকেই পড়া ধরলেন তিনি। একটি কবিতা মুখস্থ বলতে বললেন।

নির্মলা নির্ভুল উত্তর দিল। একবারও না আটকে, একটুও ভুল না করে কবিতাটা বললো।

ব্যাপার দেখে ইন্সপেক্টার তো বটেই, স্কুলের গুরুমশাইও খুব খুশি। নির্মলার মা-বাবারও আনন্দ আর ধরে না।

—কিন্তু কী করে সম্ভব হয় এমন?—বড়দের সকলেরই এক প্রশ্ন, ও তো আদৌ লেখাপড়া করে না! ওকে বুদ্ধি যোগায় কে? বোকা-হাবাটা এমন কাণ্ড করে কোন্ যাদুতে?

এ-ব্যাপারে নির্মলা নিজেই একবার বলেছিল,—কী জানো, একবার বই খুলে একটু দেখতেই একটা কবিতা মুখস্থ হয়ে গেল। ইন্সপেক্টার স্কুল দেখতে এসে ঐ কবিতাটাই আমাকে বলতে বললেন।

শুধু কবিতা কেন, নামতা এবং অন্য সব পড়াও 'আপনা-আপনি' হয়ে যেত নির্মলার। কোনোটাই তাকে কষ্ট করে শিখতে হ'ত না।

সে যে নিজেকে ভগবানের কাছে সঁপে দিয়েছে! সে যে খুবই সরল, সহজ! ভগবান কি তাকে না দেখে পারেন?

—আসলে সে নিজেই বুঝি ভগবতী!—গাঁয়ের লোকেরা বলাবলি করে,—চান্‌লা-য় পাগলা শিব দেখতে গিয়ে সেদিন কী কাণ্ডটা হলো!

ছোট্ট মেয়ে নির্মলাকে মন্দিরের বাইরে বসিয়ে সবাই গেছে শিব-দর্শনে। কিন্তু কী আশ্চর্য! মন্দির শিবহীন, বিগ্রহশূন্য।

বাইরে এসে সবাই দেখে, শিব নির্মলার পাশে। আর নির্মলা কেমন মিটি-মিটি হাসছে!

—ওরে, দেখে যা! হরগৌরীকে দেখে যা!—স্তম্ভিত ভক্তের দল চীৎকার করে ওঠে। সবাই বলে, দেখ্ দেখ্! মেয়ে তো নয়; সাক্ষাৎ ভগবতী! আমাদের সকলের মা।

কোটিকণ্ঠে আজও উচ্চারিত হয় এই একই কথা। যিনি ভগবতী, যিনি জগজ্জননী, তিনিই আমাদের মা, শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা।

[**জীবন কথা :** বর্তমান বাঙ্‌লাদেশের অন্তর্গত ত্রিপুরা জেলার খেওড়া গ্রামে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের আবির্ভাব ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল (বাংলা ১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ)। জননী মোক্ষদাসুন্দরী দেবী। পিতা বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য। মা আনন্দময়ীর পিতৃদত্ত নাম নির্মলাসুন্দরী। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রামের রমনীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে বারো বৎসর দশমাস বয়সে মায়ের বিবাহ হয়। রমনীমোহন ভক্তমহলে 'ভোলানাথ' নামে সুপরিচিত। সাধারণ গৃহীর জীবন আনন্দময়ীর নয়। তিনি সংসারে থেকেও সর্বত্যাগিনী, পরমযোগিনী, লক্ষ লক্ষ ভক্তকে পরম স্নেহে তিনি বুকে তুলে নেন, আনন্দের জীবন্ত বিগ্রহ সেজে বার বার ঘুরে বেড়ান দেশের একপ্রান্ত থেকে

অন্তপ্রান্ত। মা বলেন, ভগবান আনন্দস্বরূপ। আনন্দরূপেই খুঁজবো তাঁকে। উপাসনা করবো। আনন্দই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আনন্দ। জীবনে ভগবানকে ফুটিয়ে তোলাই আমাদের একমাত্র কাজ। দিব্য ভাগবত জীবনলাভই আমাদের পরম কাম্য। হরি-কথাই কথা, আর সবই বৃথা ব্যথা।...দেশে-বিদেশে কোটি কোটি ভক্ত আজ শ্রীশ্রীআনন্দময়ীর নামগানে মুখর। ভক্তরা এই মহা-সাধিকার মধ্যে জগজ্জননী মহামায়ার প্রতিরূপ দেখেন। শ্রীশ্রীমায়ের লীলা-সংবরণের তারিখ ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ আগষ্ট, শুক্রবার]

॥ অনুশীলনী ॥

১। "বড় ভুলো ছিল সে।"—কা'কে এখানে ভুলো বলা হয়েছে ? তার ভুলে যাওয়ার একটি ঘটনা গল্প করে বলো।

২। "ঠাকুরেরও কত যে লীলা তাকে নিয়ে !"—কা'র সম্পর্কে এই উক্তি ? ঠাকুরের লীলা সম্পর্কে কী জান ?

৩। "ব্যাপার দেখে ইন্সপেক্টার তো বটেই, স্কুলের গুরুমশাইও খুব খুশি।" —ব্যাপারটি কি ?

৪। নির্মলা কে ? তার সব পড়া 'আপনা-আপনি' হয়ে যেত বলতে কী বোঝ ?

৫। চাল্‌না-য় পাগলা শিব দেখা উপলক্ষে নির্মলাকে নিয়ে কী কাণ্ড হয়েছিল ?

৬। 'কোনো এক গাঁয়ের মেয়ে' পড়ে গাঁয়ের মেয়েটি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা হয়, নিজের ভাষায় পাঁচটি মাত্র বাক্যে বুঝিয়ে দাও।

৭। কোন্‌টি শুদ্ধ, কোন্‌টি অশুদ্ধ বলো। শুদ্ধর পাশে ✓ ও অশুদ্ধের পাশে × চিহ্ন দাও :—

(ক) মুহূর্ত আগেও কী করেছে বা কী বলেছে তা ওর মনে থাকে।

(খ) "আমার যাতে আনন্দ হয় তাই করো ঠাকুর !"

(গ) স্কুলে সে প্রায় যায়নি বললেই চলে।

(ঘ) বাইরে এসে সবাই দেখে, শিব নির্মলার পাশে।

৮। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) ঃ—

(ক) আনন্দময়ী মা কে ? তাঁকে সবাই 'মা' বলে কেন ?

(খ) আনন্দময়ী মা ছাড়া ভারতের যে কোনো একজন শ্রেষ্ঠ সাধিকার নাম বলো।

(গ) আনন্দময়ী মা কোথায় কখন জন্মগ্রহণ করেন ? তাঁর মা ও বাবার নাম কী ? 'ভোলানাথ' কে ?

———



মোটে চৌদ্দয় পা দিল সে। এরই মধ্যে এত! বলে কিনা, ঘর ছেড়ে বাইরে যাবো। সন্ন্যেসী হবো।

—সে কী রে! সন্ন্যেসী হবি কি!—ছেলের কথা শুনে মায়ের মাথায় হাত।

আত্মীয়েরা বলাবলি করে, ও সন্ন্যেসী হলে ঘর যে আঁধার হবে। খালি হবে মায়ের কোল।

প্রতিবেশীরা বলে, সোনার চাঁদ ছেলে। হীরের টুকরো বাছা আমাদের। ও চলে গেলে থাকবো কি নিয়ে?

গাঁয়ের অনেককেই বলতে শোনা যায়, অমন বুদ্ধিমান ছেলে আর তো দেখি নি। কখনও শুনিও নি যে মাত্র তেরো-চোদ্দ বছরের দুধের বাছা একবার শুনেই সব জিনিস মনে রাখতে পারে।

ওদিকে পার্শী, আরবী ও সংস্কৃত ভাষায়ও অসাধারণ দখল ওর।

কিন্তু তাতেই বা কী! মন যদি চায় ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোতে, বাউল হয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে তো ভাষাজ্ঞান দিয়ে কী হবে!

—তাই তো! তুই চলে গেলে কী হবে রে আমার?—মা হাহাকার করেন।

ছেলের টনক নড়ে এইবার। মায়ের পায়ে হাত দিয়ে সে পণ করে,—না মা, সন্যেসী আমি হবো না।

—হবো না!—বাবা খিঁচিয়ে ওঠেন একদিন,—তোর মতো তর্কবাজ একটা অপোগণ্ড সন্ন্যেসী হলেই কী যায়-আসে রে?

বাবার এই রাগের বিশেষ কারণ ছিল। ছেলেটা মাত্র ষোল বছর বয়সেই বই লিখেছিল একটা, এবং সে বইটা, ছিল হিন্দুদের পুতুল-পূজার বিরুদ্ধে। হিন্দুরা দেবদেবীর নানা রকম মূর্তি গড়ে পূজা করে, সেই পূজার বিরুদ্ধে আর কি!

—নিজে হিন্দু হয়ে ধর্মের নিন্দে? এত বড় সাহস তোর?—বাবা গর্জন করে ওঠেন।

ছেলেটা কোন জবাব দেয় না এই সব কথার। ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায় শুধু।

বাইরে বিরাট ভারতবর্ষ। বিরাট দেশ তার অসংখ্য নদী-নালা বন-পাহাড় ও মানুষ-জন নিয়ে হাতছানি দিচ্ছে।

ছেলেটা এগিয়ে চলে এবার। নিঃসঙ্গ সৈনিকের মতো। একা। পথ দুর্গম। বাধা অজস্র। পা কেটে রক্ত বেরিয়ে আসে এক-একবার। দেহ টলতে থাকে। কিন্তু তবু কিছুতেই দমে না সে। পায়ে হেঁটে মাইলের পর মাইল পাড়ি দেয়।

এছাড়া উপায়ই বা কী! আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর

আগেকার ভারতবর্ষ। রেলগাড়ী হয় নি তখন। মোটর-গাড়ীর কথা তখন কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। অতএব না হেঁটে উপায় ?

ছেলেটা হাঁটে বেশীর ভাগ সময়। কোনো সময় আবার নৌকোয় নদী পাড়ি দেয়।

কিন্তু নদী কি এক রকমের ? না কি সব নদীতে নৌকো চলে ? পাহাড় বেয়ে কল-কল খল-খল করতে করতে নামল যারা, কার সাধ্যি নৌকো চালায় তাদের বুকে। অতএব তাদের বেলায় হয় জলে নামে ছেলেটা, আর না হয় ভাঙাচোরা সব সেতুর ওপর দিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এগোয়।

এগোয়, শুধু এগোয় সে। একের পর এক ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু তা'তেই বা সুখ কোথায় ? লাভ কোথায় শুধু যাযাবর সেজে ?—ছেলেটা ভাবে একদিন। ভাবে, কত ধর্মের কত লোক থাকে এই ভারতবর্ষে ! অতএব একে জানতে গেলে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা দরকার।

কিন্তু বিপদ এই যে, এক এক ভাষায় কথা বলে এক এক প্রদেশের লোক। এর ভাষা ও বোঝে না এবং সেই কারণেই ধর্মগ্রন্থের ভাষাও এক রকম হয় না। অতএব উপায় ?

কী আশ্চর্য ! উপায় নিজেই খুঁজে বের করে ছেলেটা। ধর্মগ্রন্থ পড়বে বলে ভারতবর্ষের অনেক সব প্রদেশের ভাষা শেখে।

কিন্তু তা'তেও শান্তি নেই। তৃপ্তি নেই ধর্মগ্রন্থ পড়েও। বিদেশী ইংরেজরা তখন ভারতবর্ষের বুকের উপর দাঁড়িয়ে। এমন দেশে থেকে স্বাধীনভাবে কিছু চিন্তা করা যায় ? শান্তি পাওয়া যায় একটু ?

ছেলেটি ভাবতে ভাবতে হিমালয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়।

আকাশ-ছোঁয়া হিমালয় তাকে তখন হাতছানি দেয়। হিমালয়ের ওপারে আছে যে নিষিদ্ধ দেশ তিব্বত, সে যেন তার কাছে ডাক পাঠায়।

হ্যাঁ, তিব্বতেই যাবে সে,—ছেলেটি ঠিক করে একদিন,—ওই নতুন দেশে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানবে।

—কিন্তু তিব্বত যে অনেক দূরের পথ! অনেক পাহাড়-পর্বত নদী-নালা পেরিয়ে যে ওখানে যেতে হয়!—বাধা দিতে চায় কেউ কেউ।

কেউ কেউ আবার বলে, কাজ কি বাপু ওখানে গিয়ে। তার চেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরো।

ছেলেটি বলে,—না, ফিরবো না। তিব্বতেই যাবো।

এ যে দেখছি দ্বিতীয় আর একটি হিমালয়। কারও কাছে মাথা নোয়াবার নাম করে না।—বলাবলি করে কেউ কেউ। ওদিকে সঙ্গী-সাথীরা আশা ছেড়ে দেয়। বলে, যাক ও। তিব্বতেই যাক।

ছেলেটি কিন্তু আশা ছাড়ে না! দুর্গম পর্বতের উপর দিয়ে একাই এগিয়ে চলে।

একা, সম্পূর্ণ একা সে। তার সঙ্গী বলতে দেবদারু আর পাইন বন, আর কখনও বা তুষারে ঢাকা প্রান্তর।

নিঃসঙ্গ পথ ধরে সাবধানে এগোয় ছেলেটা। চড়াই-উৎরাই পেরোয় পা ঠুকে ঠুকে। কখনও আবার পথ রুদ্ধ হয়ে যায় যেন। বিরাট এক একটা পর্বত সামনে এসে দাঁড়ায়।

ছেলেটা পর্বতগুলোকে পাশ কাটিয়ে অতি কষ্টে পথ চলে

এবার। পর্বতের গা বেয়ে এগিয়ে-চলা ঝর্ণাগুলোকে নিশানা করে চলতে থাকে।

কিন্তু ঝর্ণারা খেলে লুকোচুরি। মাঝে মাঝে বন-পাহাড়ের আনাচে-কানচে হারিয়ে যায়!

—যাক্ হারিয়ে। হোক্ পথ ভুল। তিব্বতে আমি যাবোই—দুর্গম পাহাড়পুরীর এখানে-ওখানে প্রতিধ্বনিত হয় ছেলেটির শপথ। আর পাহাড়পুরী তার ভীষণ শূন্যতা নিয়ে কেবলই খাঁ খাঁ করে।

পাহাড়ের কি শেষ নেই? আদিঅন্ত নেই হিমালয়ের?—ছেলেটা ভাবে এক এক সময় এবং ভাবতে ভাবতেই একদিন সে এসে দাঁড়ায় রহস্যময় তিব্বতে।

তিব্বত রহস্যময়ই বটে। লামাকে তিব্বতীরা ভগবান ভেবে পূজা করে। এক লামার মৃত্যু হলে আর একজনকে ওরা লামা সাজায়।

সাজানোর ধরনটাও আবার অদ্ভুত। লামার মৃত্যু হলে কোনো বালককে বেছে নেয় ওরা। এমন কোনো বালককে নেয়, যার মধ্যে ভগবানের লক্ষণ আছে বলে ওদের বিশ্বাস।

ওদের আরও বিশ্বাস, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে লামা এক শরীর পরিত্যাগ করে অন্য এক শরীর আশ্রয় করেন এবং এই শরীরটা বিশেষ কোনো বালকের হয়ে থাকে।

ছেলেটি তিব্বতীদের এই সব আচার-আচরণ দেখে বিস্মিত হয়, সাধ্যমতো এদের প্রতিবাদও করে। বলে, পুতুল-পূজা যেমন, এ-ধরনের মানুষ-পূজাও তেমনি অন্যায়।

—অন্যায়? বলে কী! —ছেলেটির কথা শুনে তিব্বতীরা থ। ওকে মারবে বলে তখনই দল বেঁধে এগিয়ে আসে ওরা।

ওদিকে এগোয় তিব্বতী নারীরাও। ছেলেটিকে ওরা আশ্রয় দেয়।

এই আশ্রয়েরই কি প্রতিদান ছেলেটি বড় হয়ে একদিন দেয় নি ? ভারতবর্ষে সতীদাহ-প্রথা রামমোহন রায়ের চেষ্টায়ই কি বন্ধ হয়নি ?

●

[**জীবন-কথা :** রাজা রামমোহন রায় ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ কর্মবীর, সাহিত্য-স্রষ্টা এবং সমাজ-সংস্কারক। হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামকান্ত, মাতার নাম তারিণী। আরবী-ফারসী পড়ে তাঁর মনে হিন্দুধর্মের আচার-বিচার সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে এবং চৌদ্দ-পনের বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে তিনি কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ একেশ্বর উপাসনার পথ দেখান এবং ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। সতীদাহ-প্রথা নিবারণে তিনি অশেষ সাহায্য করেন। রামমোহন বহুভাষাবিদ্, বাংলা গদ্যের জনক। আমাদের ইংরেজী ও বিজ্ঞান শিখতে হবে, এ-কথা তিনিই এদেশে প্রথম উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেন। দিল্লীর বাদশাহ্ তাঁকে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন। ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের ব্রিস্টলে তাঁর মৃত্যু হয়।]

॥ অনুশীলনী ॥

১। একলা চলত কে ? গাঁয়ের লোকেরা ওকে ভালোবাসত কেন ? বাবা কেন ওর উপর রাগ করেছিলেন ?

২। ছেলেটা ভারত-ভ্রমণে গেল কেন ? কেমন করে সে ভ্রমণ করল ? কী কী দেখল ? ভারতবর্ষকে জানবে বলে সে আর কী করেছিল ?

৩। তিব্বত কোথায় ? ছেলেবেলায় কে ওখানে গিয়েছিল ? কেমন করে এবং কেন ? তিব্বতে সে কী দেখল ?

৪। নীচের বাক্যাংশগুলিকে ঠিকভাবে সাজাও :—

(ক) প্রতিবেশীরা বলে	বাছা আমাদের
(খ) হীরের টুকরো	সোনার চাঁদ ছেলে

(গ) এক এক ভাষায় কথা বলে　　বের করে ছেলেটা

(ঘ) উপায় নিজেই খুঁজে　　এক এক প্রদেশের লোক

৫। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) ঃ—

(ক) ভারতবর্ষের হু'টি ধর্মগ্রন্থের নাম কর।

(খ) যে-কোন তিনটি ভারতীয় ভাষার নাম কর।

(গ) 'ইংরেজরা তখন ভারতবর্ষের বুকের উপর দাঁড়িয়ে'—এই উক্তিটির মানে কী ? ভারতবর্ষ কবে স্বাধীন হল ?

(ঘ) দেবদারু গাছ দেখতে কেমন ? ঝাউ বা পাইন জাতীয় কোনো গাছ দেখেছ ? কেমন দেখতে ?

(ঙ) পুতুল-পূজা কী জিনিস ? অন্ততঃ তিনটি পুতুল-পূজার নাম বলো।

———



ছেলেটা গরীব। ভীষণ গরীব। অনেক কষ্টে খাওয়া-পরা জোটে। রান্নাবান্না নিজের হাতেই করে। কিন্তু রান্নাঘর?

নরককুণ্ডের চেয়েও জঘন্য। জানালার অভাবে আলোক ঢোকে না এবং আলোকের অভাবে আনন্দের সেখানে প্রবেশ-নিষেধ।

ঐ নরককুণ্ডের মধ্যে বসেও সে লেখাপড়ার কথা ভাবে ; দেখে সত্যিকারের মানুষ হবার স্বপ্ন।

কিন্তু স্বপ্ন প্রতি মুহূর্তে ভেঙ্গে যায় বুঝি!—ছেলেটা শিউরে ওঠে মাঝে মাঝে। ভাবে, এই বুঝি নরককুণ্ড তাকে বন্দী করে! ওদিকে নরক থেকে তুর্গন্ধ ভেসে আসে প্রায়ই। রান্নাঘরের পাশেই তু'টো খাটা পায়খানা। তুর্গন্ধ আসে সেখান থেকে।

আর শুধু কি পায়খানা! বড়সড় একটি নর্দমাও রান্নাঘরের

পাশেই। পায়খানার কীটগুলো ওই নর্দমা ধরে ভ্রমণে বেরোয়। প্রায়ই দেখা যায়, ভ্রমণ করতে করতে ওরা রান্নাঘরে ঢুকছে। কিলবিল করতে করতে ছেলেটাকে একেবারে ঘিরে ফেলছে আর কি!

কিন্তু ছেলেটা এত সহজে হার মানলে তো! জল নিয়ে সারাক্ষণ সে বসেই থাকে এবং যখনই দেখে কিলবিল করতে করতে অতিথিরা সব আসছে, তখনই ওদের গায়ে জল ঢেলে দেয়; রান্নাঘরটা ধুয়ে দেয় ভাল করে।

কিন্তু দিলে কি হবে! খানিক বাদেই আবার আসে ওরা; এবং ছেলেটিও আবার জল ঢালে। ওদিকে আরসোলারা ঘরময় দাপাদাপি সুরু করে। ডাল, ভাত আর তরকারীর ওপর ওদের বিশেষ লোভ এবং একবার ওখানে গিয়ে পড়তে পারলে সহজে আর উঠতে চায় না।

একদিন। না-উঠে-আসা ঐরকম একটিকে নিয়ে ফ্যাসাদ একেবারে।

ব্যাপার কী?—না ছেলেটি তার ভাই আর বাবাকে নিয়ে খেতে বসেছে। এমন সময় হঠাৎ দেখে, তরকারীর মধ্যে ওদের একটি! দেখে, ঝোল আর মশলা গায়ে মেখে রীতিমত সমাধিস্থ সে!

ছেলেটি কাউকে কিছু বলে না। সমাধিস্থ আরসোলাটাকে ফেলেও দেয় না।

কারণ, ফেলে দিলেও বিপদ। বাবা বা ভাই দেখে ফেলবে এবং সেদিনকার মতো খাওয়াটাই হয়তো মাটি হবে ওঁদের।

তাই ছেলেটি করে কি—আরসোলাটাকে নিয়ে নেয় নিজের পাতে এবং নিজেই সেটাকে—হ্যাঁ, সেটাকে খেয়ে নেয়। অভাবের

সংসারে অন্য কারও খাওয়া নষ্ট হোক, এটা তার আদৌ ইচ্ছে নয়।

—ওর ইচ্ছেটা আসলে কী? কী চায় ও? সেরা পণ্ডিত হতে?—স্কুলের মাস্টারমশাইরা বলাবলি করেন।

কেউ কেউ আবার বলেন,—পণ্ডিত তো হয়েই আছে ও! এই চৌদ্দ বছর বয়সেই তো চতুর্দশ রকম শাস্ত্র ও গিলে বসে আছে।

কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয়। সংস্কৃত কাব্য, নাটক, ব্যাকরণ অনর্গল মুখস্থ বলতে পারে ছেলেটা।

একবার শুনলেই সব কিছু ওর মনে থাকে। এছাড়া, ওর হাতের লেখাও ভারী সুন্দর। প্রতি বছর এজন্য ও প্রথম পুরস্কার পায়।

ওদিকে মাস্টারমশাই ওই কৃতী ছেলেটির হাত দেখে একদিন থ।

—ওগুলো কিসের দাগ? তোর হাতে?—তিনি জানতে চান।

ছেলেটি বলে,—হলুদের।

—হলুদ কেন বাবা?

—রান্না করি, তাই।

—রান্না! মানে?

—আরও অনেক কিছু আর কি! হলুদ বাটি, কাঠ চেলা করে উনুন ধরাই, বাসন মাজি।

—বাসনও মাজিস?

—হ্যাঁ। এই যে, দেখুন না; মেজে মেজে নখ আর আঙুলগুলো ক্ষয়ে গেছে,—বলেই সে তার হাতটা তুলে ধরে মাস্টারমশাইয়ের সামনে।

মাস্টারমশাই বলেন,—তাইতো! সত্যিই তো ক্ষয়ে গেছে!

কিন্তু ছেলেটার ওদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও সামান্য একটু পড়বার সুযোগ পেলে সে আহ্লাদে আটখানা। মোটা ভাত, মোটা কাপড়েই সে খুশি।

কাপড় আসে গ্রাম থেকে। মা চরকা দিয়ে কাটেন সুতো। সেই সুতোয় কাপড় বোনা হয়। ওদিকে গ্রামের লোকেরা বলে,—মা বোনে কাপড়; আর ছেলে বানায় কবিতা।

এই কবিতার কথাটাও কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

সত্যিই গ্রামে গিয়ে যখন-তখন কবিতা বলে ছেলেটা। যখনই শোনে, শ্রাদ্ধশান্তি হচ্ছে কারও বাড়িতে, তখনই সংস্কৃতে কবিতা লিখে সবাইকে অবাক করে দেয়।

কিন্তু অবাক বোধ করি সবচেয়ে বেশী হয়েছিলেন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মশাই।

অলঙ্কার-শ্রেণীতে অধ্যাপনা করতেন তিনি; এবং যখনই তিনি দেখতেন, অলঙ্কারশাস্ত্র পড়তে যারা আসছে, মূর্তিমান এক-একটি গবেট ছাড়া তারা কিছু নয়, তখনই তাঁর আর দুঃখের সীমা থাকত না।

সেই তর্কবাগীশ মশাইকে হঠাৎ খুব আনন্দিত মনে হল একদিন। মনে হল, এই গবেটদের রাজ্যে তিনি যেন নতুন কিছুর সন্ধান পেয়েছেন।

—ব্যাপার কী মাস্টারমশাই? কী ব্যাপার?—তর্কবাগীশ মশাইকে সবাই একযোগে শুধায় সেদিন।

তর্কবাগীশ বলেন,—ব্যাপার গুরুতর। অলঙ্কার-শাস্ত্রের ক্লাশের সবচেয়ে ছোটখাটো ছেলেটাই কিস্তি মাৎ করে দিয়েছে। বাৎসরিক পরীক্ষায় অন্য সকলকে টেক্কা দিয়ে প্রথম হয়েছে সে।

—প্রথম তো হবেই !—বলেছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির বাড়িতে ছেলেটাকে সাহিত্যদর্পণের আবৃত্তি করতে শুনে একথা বলেছিলেন।

জয়নারায়ণ আরও বলেছিলেন,—এ বড় অদ্ভুত ছেলে ! বয়স বাড়লে দেশের অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে।

এদিকে ছাড়িয়ে কিন্তু এরই মধ্যে যাচ্ছে। মাসে আট টাকা করে বৃত্তি পাচ্ছে ও ; আর সেই বৃত্তির টাকাটা তুলে দিচ্ছে বাবার হাতে।

বাবা ওই টাকা দিয়ে গ্রামে জমি কিনেছেন।

কিন্তু ছেলেটার ও নিয়ে মাথাব্যথা নেই। ওর মাথা ধরে পরের দুঃখ দেখলে।

—কে গো তুমি, অমন শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে ! খেতে পাওনি বুঝি !—প্রায়ই বলতে শোনা যায় ওকে এবং প্রায়ই দেখা যায়, নিজের খাবার সে ওই শুকনো মুখগুলির মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছে।

—তুমি কে গো, ছেঁড়া কাপড় পরে ?—এক একদিন উপযাচক হয়েই জানতে চায় ও এবং নিজের হাতে পয়সা না থাকলে ধার করে দীনদুঃখীদের ও কাপড় কিনে দেয়।

—তুমি আবার কে ? একলা ঘরে গোঁঙাচ্ছ ? রুগী বুঝি ? কেউ নেই বুঝি তোমার ?....কিন্তু তাতে কী ! আমি তো আছি !

—তুমি কে ?—রুগী জানতে চায়।

—আমি তোমার বন্ধু—বুঝিয়ে দেয় ছেলেটা। বলে, তোমার সেবা করতেই তো ভগবান আমায় পাঠিয়ে দিলেন গো !

কিন্তু এ কেমনতর সেবা ! কলেরা রুগীর বিষ্ঠা পরিষ্কার করে যোল বছরের এক ছেলে, বড়রা সব কোথায় ?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেশের লোক আমরা। রোগশোকে জর্জরিত দেশের এই দারুণ দুর্দিনে আজও আমাদের একই প্রশ্ন,—বড়রা সব কোথায়? ছেলেরাই বা পেছিয়ে কেন?

●

[**জীবন-কথা**: মহৎ-প্রাণ, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এদেশের একজন প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। জন্ম ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে, মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্র ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে পায়ে হেঁটে কলকাতা আসেন এবং দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে লেখাপড়া করেন। সংস্কৃত ভাষায় তো বটেই, ইংরেজীতেও তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। এদেশে শিক্ষার বিস্তারে এবং বিশেষ করে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান অসামান্য। এছাড়া, বিধবা-বিবাহের প্রচলনে এবং বহু-বিবাহের নিরোধে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যথার্থ-ই বলেছেন, "প্রাচীন ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরেজের উদ্যম এবং বাঙালী মায়ের হৃদয়" তাঁর চরিত্রে মিলেছিল। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় তাঁর তিরোধান ঘটে।]

॥ **অনুশীলনী** ॥

১। ছেলেটা কে? তার রান্নাঘর কেমন ছিল? ওখানে বসে সে কী ভাবত? কী করত?

২। আরসোলা খেল কে? কেন খেল? ঘটনাটা বলো।

৩। ওগুলো কিসের দাগ? তোর হাতে?—কে বলেছিলেন? কা'কে? কেন?

৪। পরের দুঃখ দেখলে ছেলেটা কী কী করত?

৫। কোন্‌টি শুদ্ধ, কোন্‌টি অশুদ্ধ বলো। শুদ্ধর পাশে ✓ ও অশুদ্ধর পাশে × চিহ্ন দাও :—

(ক) জানালার অভাবে আলোক ঢোকে। (খ) সামান্য একটু পড়বার সুযোগ পেলে সে দুঃখে আটখানা। (গ) মা চরকা দিয়ে কাটেন সুতো। (ঘ) মোটা ভাত, মোটা কাপড়েই সে খুশি।

৬। নীচের বাক্যাংশগুলিকে ঠিকভাবে সাজাও :—

(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের	মাথাব্যথা নেই
(খ) ছেলেটার ও নিয়ে	দেশের লোক আমরা
(গ) একবার শুনলেই	ভ্রূক্ষেপ নেই
(ঘ) ছেলেটার ওদিকে	সব কিছু ওর মনে থাকে

৭। প্রশ্নাবলী (মৌখিক)—

(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কে ছিলেন ? তিনি কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ?

(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দয়ার সাগর বলা হয় কেন ?

(গ) বিদ্যাসাগরকে তুমি কী কী কারণে শ্রদ্ধা কর ?

———



ফুলবাবুর কীর্তি

ছেলে তো নয়, যেন জামাইবাবু। বাবুরও বাবু ফুলবাবু। খাস বিলেত থেকে আমদানী সাহেব-বাবু।

আট বেহারার পালকিতে চেপে স্কুলে যায়। রোজ খিদিরপুর থেকে পটলডাঙ্গা পাড়ি দেয় ফুলবাবুর চালে।

বাবুর আবার মেজাজ বিগড়ে যায় একটুতেই। বিলেতী সেণ্ট্ ল্যাভেণ্ডার না হলে একটি দিনও চলে না। আর শুধু কি সেণ্ট্! জামা-কাপড়ের বাহার কত! খিদিরপুর থেকে পটলডাঙ্গা আসতে আসতে পালকিতেই পোশাক বদল হয়ে যায় একবার এবং তারপর স্কুলে এসে হয় আরও কয়েকবার।

বাবুর পোশাকের কি ছিরি! সাহেবকে বলে, তফাৎ যাও।

—সাহেবই বটে! ক্লাশের ছেলেরা বলাবলি করে,—খাঁটি

সাহেব একেবারে ! যেমন ওর ঝকঝকে কোট-প্যাণ্ট, তেমনি 'টাই'। আর জুতো কী সাহেবের ! যেন এক-জোড়া আয়না।

সাহেব ইংরেজীও বলে বড় সুন্দর। শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায় !

ওদিকে আবার কবিতাও লেখে। ইংরেজী ভাষায়।

ছাত্র-শিক্ষক সবাই বলে, ওর ছন্দ যেমন, মিলও তেমনি নির্ভুল একেবারে।

—নির্ভুল তো হবেই,—ক্লাশের বন্ধুরা একে অপরকে বলে,—রাত্তিরে ঘরে বসে চুপিসারে লিখলে জিনিস তো ভালো হবেই।

কথাটা কিন্তু সত্যি। রাত্তিরে নিরিবিলিতে বসে সত্যি কবিতা লেখে ছেলেটা। আর দিনে স্কুলে এসে বন্ধুদের সেগুলো পড়ে শোনায়।

কিন্তু শুনিয়েই কি শুধু তৃপ্তি !

—এই যে, নাও। এ কবিতাটা তোমার !—

এক এক সময় বন্ধুদের কাউকে চমকে দেয় ও।

বন্ধু পড়ে আকাশ থেকে,—আমার !

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার নামেই এটা উৎসর্গ করেছি। কবিতাটা লিখেছি তোমার জন্যেই। ওটায় নাম লিখে দিয়েছি তোমার। বন্ধুরা খুশি হয়। বলে,—দেখে নিও। তুমি সত্যি একদিন বড় কবি হবে।

ওদিকে কবিকে নিয়ে মাষ্টারমশাইদের ধারণাও খুব উঁচু। রিচার্ডসন সাহেব তো একদিন নিজের কাগজেই ওর কবিতা ছেপে দেন ; এবং তারপর উৎসাহ দিয়ে বলেন, লেখ তুমি। আরও লেখ।

ছেলেটি লেখে। রিচার্ডসনের উৎসাহে বাংলাদেশের আরও বহু কাগজেই ওর কবিতা ছাপা হয়।

—কিন্তু শুধু দেশী কাগজে লিখে লাভ ?—ছেলেটি ভাবে, লণ্ডনের ইংরেজী কাগজে না লিখলে সত্যিকারের কবি হয় কেউ ?

ছেলেটি সেদিনই একটি কবিতা পাঠিয়ে দেয় লণ্ডনের 'বেণ্টলিস মিসলেনি' নামে এক পত্রিকায়।

ছেলেটার বিদ্যেবুদ্ধি যথেষ্টই ; এবং বিদ্যেকে বাড়াবার জন্যে আগ্রহও প্রচণ্ড। ক্লাশের পাঠ্য বইগুলো সকলের আগে পড়ে ফেলে ও। এবং তারপর পড়ে বাইরের বই। কবিতা আর ইতিহাস পড়তে পেলে সবকিছু ও ভুলে যায়।

ছেলেটার এই পড়ার আগ্রহ দেখেই একদিন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ডেভিড হেয়ার ভালবেসে ফেলেন ওকে। বলেন, মাই বয় ! তুমি সত্যি একদিন বড় হবে।

ওদিকে বাবু-ছেলেটির কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। এক মোহর খরচ করে কোনো এক সাহেবের সেলুন থেকে চুল ছেঁটে আসে। বলে, ছ্যাখ তো, কেমন সুন্দর হয়েছে ! কেমন সস্তায় হয়েছে চুল-ছাঁটা !

—সস্তায় মানে ? বন্ধুদের কেউ কেউ জানতে চায়।

ও বুঝিয়ে দেয়, এক মোহরে।

মোহরের কথা শুনে চোখ কপালে ওঠে ছেলেদের। কিন্তু বাবু-কবি তোয়াক্কাই করে না এসব। নিজের খেয়াল-খুশি মাফিক সব কাজ করে। কোনদিন খেয়াল হয়, গান গাইবে। আর অমনি গান ধরে ; গাঁয়ের মৌলবী-স্যারের কাছ থেকে শেখা ফার্সী গজলগুলো একের পর এক গেয়ে যায়। কোনদিন আবার গানে মন ওঠে না। খিদিরপুরের বাড়িতে বন্ধুদের ডেকে নিয়ে গিয়ে আদর-আপ্যায়ন আর হৈ-হুল্লোড় না করলে মেজাজ চাঙ্গা হয় না।

একবার এক সহপাঠীর চার মাসের মাইনে বাকী। স্কুলকর্তৃপক্ষ

ওকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, হয় মাইনে দাও, না হয় স্কুল ছাড়ো।

—স্কুলই ছেড়ে দেবো স্যার!—সহপাঠী ওই গরীব ছেলেটি বলে।

একদিন বাবু-কবির কানে যায় কথাটা। আর যেতেই সহপাঠীর কাছে ছুটে যায় সে। বলে,—স্কুল ছাড়বে কেন ভাই?

—মাইনে বাকী।

—মাইনে আমি দিয়ে দিচ্ছি; স্কুল তুমি ছেড়ো না।

ছেলেটা শেষ অবধি স্কুল ছাড়েনি। বাবু-কবি ওর সব মাইনে দিয়েছিল।

কবি ওই এক রকমের। কখন্ যে গরীবের দুঃখ দেখে ওর প্রাণ কেঁদে উঠবে, তা ও নিজেই বুঝি জানে না।

আর জানবেই বা কি করে! গরীব-দুঃখীরা তো আর আগে থাকতে সময় ঠিক করে কারও সঙ্গে দেখা করতে আসে না। বেশির ভাগ ওরা পথে-ঘাটেই থাকে। আর যেদিন খুব বেশি পরিমাণে থাকে, সেদিন আমাদের বাবু-কবির পকেটটিও দেখতে দেখতে খালি হয়ে যায়। সব পয়সা গরীবদের দিয়ে দেয় ও।

সত্যি ও গরীবদের কথা ভাবে। আর ভাবে দেশের নারীদের কথা, ওদের শিক্ষার কথা। এবং এইসব আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতেই একদিন এক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে বসে ও। প্রবন্ধের বিষয় 'স্ত্রীশিক্ষা'। লিখতে হবে ইংরেজীতে।

ছেলেটা সে প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে সোনার মেডেল পেল। ওদিকে স্কুলের পরীক্ষায় তো বটেই, বৃত্তি পরীক্ষায়ও খুব ভালো ফল করেছিল সে এবং ওই সব পরীক্ষারই দৌলতে এক সঙ্গে দু-তিনটি করে ক্লাশ ডিঙিয়ে যাচ্ছিল।

ফলে, মাত্র পাঁচ বছরে হিন্দু কলেজে পড়া শেষ হয়ে গেল ওর! এবং ওর চেয়ে যারা বয়সে অনেক বড়, তারা পড়ে রইল ওর চেয়ে অনেক নীচু ক্লাশে।

—ছেলেটা কে গো!—অবাক হয় অনেকেই। বলে, দেখছি বাবুগিরিতে যেমন, লেখাপড়ায়ও তেমনি! গদ্যে যেমন, পদ্যেও তেমনি।

হিন্দু স্কুলের ছেলেরা বলে, তেমন তো একজনই আছে দেশে। আর সে হল মধুসূদন দত্ত।

[**জীবন-কথা:** বাংলার অতি প্রিয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে যশোহর জেলার (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত) সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্ম। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। মধুসূদন গ্রামের পাঠশালায় এবং মা জাহ্নবী দেবীর তত্ত্বাবধানে বাড়িতে প্রাথমিক পাঠ শেষ করে কলকাতায় এসে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। তিনি কৃতী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সময় তাঁর কবিত্বের বিকাশ ঘটতে থাকে। তিনি ইংরেজীতে কবিতা লিখতে শুরু করেন। মধুসূদনের জীবনে এর পরবর্তী কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা হল ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ, ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজ গমন এবং ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। কলকাতায় ফিরে তিনি বঙ্গভাষা-চর্চায় মনোযোগ দেন; লেখেন মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কাব্য এবং কিছু নাটক। বাংলা কাব্যে তিনিই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে ব্যারিস্টারি পড়বার জন্যে তিনি বিলাত-যাত্রা করেন। বিদেশে অর্থের অনটনে পড়লে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে সাহায্য করেন। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে ব্যারিস্টার হয়ে তিনি দেশে ফেরেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে তিনি সফল হন নি। তাঁর শেষ জীবন চরম দুঃখ ও দারিদ্র্যে পূর্ণ। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।]

॥ অনুশীলনী ॥

১। ফুলবাবু কে? তার বাবুগিরির কথা কিছু বলো।

২। ওদিকে সাহেব আবার কবিতাও লেখে।—সাহেবটি কে? কবিতা লিখে সে কী কী করত?

৩। বাবু-কবিটির খেয়াল সম্বন্ধে বলো। ও যে গরীবদের কথাও ভাবত, তার প্রমাণ কী?

৪। দেখছি বাবুগিরিতে যেমন, লেখাপড়ায়ও তেমনি। গদ্যে যেমন পদ্যেও তেমনি!—কা'কে লক্ষ্য করে এই কথাগুলো? তার লেখাপড়া ও গদ্য-পদ্য সম্বন্ধে কী জানো?

৫। কোন্‌টি শুদ্ধ, কোনটি অশুদ্ধ বলো। শুদ্ধর পাশে ✓ ও অশুদ্ধর পাশে × চিহ্ন দাও:—

(ক) আট বেহারার নৌকোয় চেপে স্কুলে যায়।

(খ) জুতো কী সাহেবের! যেন এক জোড়া আয়না।

(গ) রাত্তিরে দল-বেঁধে বসে সত্যি কবিতা লেখে ছেলেটা।

(ঘ) একসঙ্গে দু-তিনটি করে ক্লাশ ডিঙিয়ে যাচ্ছিল।

৬। শূন্যস্থান পূর্ণ কর:—

(ক) ডেভিড হেয়ার—ফেললেন ওকে।

(খ) বাবু-কবির—দেখতে দেখতে খালি হয়ে যায়।

(গ) প্রবন্ধের বিষয়—।

(ঘ) প্রথম হয়ে—মেডেল পেল।

৭। প্রশ্নাবলী (মৌখিক):—

(ক) এদেশের যে-কোনো তিনজন বড় কবির নাম বলো।

(খ) ডেভিড্ হেয়ার কে ছিলেন?

(গ) 'স্ত্রীশিক্ষা' বলতে কী বোঝায়?

———



—ওরে দ্যাখ্ দ্যাখ্! স্বয়ং শিব বুঝি! কৈলাস থেকে নেমে এলেন!—যাত্রার আসরে বলাবলি করে অনেকেই।

বড়রা কিন্তু চুপ। টুঁ শব্দটি নেই মুখে। শিব দেখে সবাই অবাক একেবারে। যেন সবাই একই কথা বলতে চান,—আহা! মরি মরি! কী রূপ! শিবের কী শোভা! গায়ে ভস্ম, গলায় আর, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। ত্রিশূল নিয়ে ভক্তদের ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে।

অথচ হুবহু এমন করে দাঁড়াবার কিন্তু কথা ছিল না। ঠিক ছিল, এই যে শিবচতুর্দশী পালা হচ্ছে আজ, এতে শিবের অভিনয় আর একজন করবে।

শোনা গেল, সে নাকি অসুস্থ, শয্যাশায়ী বলতে গেলে। তাই 'তা'র জায়গায় ছেলেটিকে শিব সাজান হয়েছে।

কিন্তু কত আর বয়স ওর? বড় জোর তেরো-চৌদ্দ?—দর্শকদের কেউ কেউ শুধোয়।

যাত্রাদলের যিনি পাণ্ডা, অর্থাৎ কিনা যিনি অধিকারী, দুরু দুরু বুকে তিনি জবাব দেন,—তা হবে।

কিন্তু অধিকারীর ভয় কিছুতেই যেন আর কাটে না।

—পারবে তো ছোকরাটা? শিবের অভিনয় বলে কথা! পারবে তো?—বারবার তিনি ভাবেন।

ওদিকে ছোকরা কিন্তু পেরে বসে আছে। কয়েক হাজার লোক ওর কাজ দেখে থ।

কী ব্যাপার?

না, ছোকরাটা শিবের অভিনয় করতে করতে জ্ঞান হারায় যেন। হঠাৎ কেমন যেন হয়ে যায়। তার ঠোঁট কাঁপছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে ঝরঝর করে।

এমন তো কথা ছিল না! অবাক হয়ে অধিকারী তাকান শিবের দিকে। দেখেন, চোখের জলে জামাকাপড় ভিজে গেছে ওর। সারাটা দেহ থর থর করে কাঁপছে।

—ধরো! ধরো ওকে! বাঁচাও। পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙবে এক্ষুণি, অধিকারী চিৎকার করে ওঠেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই সোরগোল লাগে আসরে। কয়েকজন ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে ধরে।

কিন্তু ধরেও কি শান্তি আছে? নিশ্চিন্ত হবার জো আছে এতটুকু?

ছেলেটা গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে। যেন চোখ বুজে তপস্যা করছে!

সবাই মিলে ধরাধরি করে ওকে বাড়িতে নিয়ে গেল। জল দিল চোখে। হাত-পাখার বাতাস দিল। কিন্তু জ্ঞান আর ফেরে না। তিন দিন তিন রাত্রি ও যেন নেশার ঘোরে থাকে।

—দুষ্টুমি নয় তো এসব ? সবাইকে ভয় দেখাবে বলে ফন্দী ফিকির আঁটে নি তো ছেলেটা ?—পাড়া-প্রতিবেশীরা বলাবলি করে।

ওদের দোষ নেই। এইতো সেদিন, গ্রামের কিছু পুরুষকে আচ্ছা করে জব্দ করল ও। মেয়ের পোশাক পরে, কলসী কাঁখে নিয়ে সকলের সামনে দিয়ে ও গেল পুকুরঘাটে জল আনতে। অথচ কেউ ওকে চিনতে পারল না।

অবশ্য চিনবেই বা কী করে ? মেয়ে সাজলে যে হুবহু মেয়েই মনে হ'ত ওকে। রাধা সাজালে রাধা, আবার রাধার সঙ্গী বৃন্দা সাজালে হুবহু বৃন্দা।

গাঁয়ের মেয়েদের খুশি করবে বলে এই রকম কত সেজেছে ও ! কতবার যে অভিনয় করেছে !

কা'রও মন ভালো নেই। মুখ ভার !

অমনি ছেলেটা এগিয়ে যেত, ওমা ! এ আবার কি ? আমি থাকতে !—বলেই যাত্রাদলের সঙ্-এর অভিনয় শুরু করত। আর না হয় করত ভাঁড়ের অভিনয়।

—পুরো যাত্রাটাই দেখিয়ে দে না বাবা ; যা' হোক কিছু একটা পালা ধর !—আবদার করতো কেউ কেউ।

ছেলেটা বলতো, পালা ? বেশ, তাই ধরছি—

বলেই একা বিভিন্ন সব চরিত্রে অভিনয় করত। দরকার-মাফিক গলার সুর বদল করত যখন-তখন।

কেউ কেউ আবার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত ওর দিকে। ওর লম্বা চুল আর সুন্দর চেহারার মধ্যে কী যেন খুঁজত।

—কী খুঁজছ গো ? অত করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী দেখছ ?—ও প্রশ্ন করত এক এক সময়।

পাড়া-প্রতিবেশীরা বলতো,—সোনা আমাদের! দেখছি তোমাকে।

—আমাকে?

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আর কা'কে দেখবো? তা বাবাসোনা, গানটান শোনাও না একটু।

—কী গান শুনবে?

—বাউল, কবি, কীর্তন,—যা' তোমার খুশি।

ছেলেটা ঠিক শোনাত। কবি বা কীর্তন শোনাত কখনও, কখনও আবার বাউল।

গাঁয়ের লোকেরা অবাক হয়ে শুনত সেই গান। কেউ কেউ আবার বলতো,—আহা! অমন হীরের টুকরো ছেলে! যাত্রাদলের কেউ পেলে লুফে নেবে।

তা শেষ অবধি লুফেই নিল। ঠিক যাত্রার দলে না নিক, দল সম্পর্কে আগ্রহীরা নিল।

গ্রামের কয়েকজন মিলে একবার ঠিক করল, দল করবে; যাত্রাদল। এবং অভিনয়-শেখাবার ভারটা প্রথমে ওরা ওই ছেলেটিকেই দেবে।

প্রস্তাব শুনে ছেলেটি তো মহা খুশি। বললো, ভালো, খুব ভালো কথা। কিন্তু মহড়া কোথায় হবে? অভিনয়টা সব শিখবে কোথায়?

উদ্যোক্তারা বললো, কেন! ঘরে।

ছেলেটি বললো, না, বাইরে। সামনে ওই মাণিকরাজার আমবাগানে।

—কেন? বাগানে কেন?

—বাঃ রে ! মা-বাবা, পাঠশালার মাস্টারমশাই, সবাইকে ফাঁকি দিতে হবে না ?

এদিকে ফাঁকিটা কিন্তু দেখতে দেখতে জমে উঠল। পাঠশালা-পালিয়ে অনেকেই এসে জুটল ওই আমবাগানে।

সে কি অভিনয় ! শ্রীরামচন্দ্র কেউ, কেউ রাবণ। শ্রীকৃষ্ণ কেউ, কেউ অর্জুন। একসঙ্গে দু'তিনটে পালার মহড়া চলতে লাগল।

ছেলেটা দারুণ ব্যস্ত। শ্রীরামচন্দ্রের অভিনয় করে কখনও, কখনও শ্রীকৃষ্ণের। আবার কখনও দরকার পড়ে তো একাই বিভিন্ন সব চরিত্রের পাঠগুলো মুখস্থ বলে যায়। গানে-অভিনয়ে আমবাগান মাতিয়ে তোলে।

এদিকে কিছুদিন বাদে অভিনয় বন্ধ। দাদার সঙ্গে কলকাতায় এসে গঙ্গামাটি দিয়ে শিবমূর্তি গড়ে ছেলেটা। পূজো করে।

কখনও আবার ধ্যানে বসে আমলকি-বনে ঢুকে যোগ অভ্যেস করে।

একদিন। ঐরকম যোগ করছে সে। তন্ময় হয়ে তপস্যা করছে। এমন সময় যেন তার সামনে এলেন এক অপরূপ দেবীমূর্তি।

যেন আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে দেবীর দেহ থেকে। তাঁর রূপের ছটায় চারিদিক ঝলমল করছে।

ঠিক দেবীর পাশেই কে ও ? হুপ্ করে এসে লাফিয়ে পড়ল। হনুমান ? শ্রীরামভক্ত হনুমান ?

দেবীটি কি তবে সীতা ? ভক্তের ডাকে অমন করে ছুটে এলেন ?

কিন্তু ভক্তের যে হুঁস নেই ! তপস্যা করছে তো করছেই ! দেবী কখন্ যে এসে মিলিয়ে যাচ্ছেন তার দেহে, দেখছেই না !

কে এই ভক্ত ?

লোকে বলে, কে আবার ! গদাধর, গদাই গো ! বড় হয়ে ইনিই তো শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস হলেন গো !

[**জীবন-কথা ঃ** রামকৃষ্ণ পরমহংস ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, মাতা চন্দ্রমণি দেবী। বাল্যনাম গদাধর। শৈশব থেকেই তিনি ভগবৎপরায়ণ। অল্প বয়সেই দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীমন্দিরে পূজারী হয়ে আসেন এবং মৃন্ময়ী দেবীমূর্তির মধ্যে চিন্ময়ী জগন্মাতার দর্শন পান। বিভিন্ন ধর্মমার্গের সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি প্রচার করেন, 'সব ধর্মই সত্য ; যত মত তত পথ।' স্ত্রী সারদামণিকে তিনি জগদম্বা-জ্ঞান করতেন। ক্রমে তাঁর সাধক জীবনের মহিমায় এবং সঙ্গীত ও উপদেশে অসংখ্য লোক আকৃষ্ট হয় এবং তাঁকে যুগাবতার বলে স্বীকার করে। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি গলরোগে আক্রান্ত হন এবং ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।]

॥ অনুশীলনী ॥

১। যাত্রাদলের শিবটি আসলে কে ? শিব সেজে কেমন দেখাচ্ছিল ওকে ? অভিনয় করতে গিয়ে ওর কী কী হয়েছিল ?

২। "অথচ কেউ ওকে চিনতে পারল না।"—কেন চিনতে পারল না ? কা'কে ? গাঁয়ের মানুষদের খুশি করবে বলে ও কী কী করত ?

৩। 'যাত্রাদলের বাউণ্ডুলে'কে চেন ? মাণিকরাজার আমবাগানে কেন গেল ও ? গিয়ে কী করল ?

৪। গদাধর কে ? আমলকী বনে ধ্যান করবার সময় তার কী হয়েছিল ?

৫। কোন্‌টি শুদ্ধ, কোনটি অশুদ্ধ বলো। শুদ্ধর পাশে ✓ ও অশুদ্ধর পাশে × চিহ্ন দাও :—

(ক) কলসী বুকে নিয়ে সকলের সামনে দিয়ে ও গেল পুকুরঘাটে জল আনতে।

(খ) কারও মন ভালো আছে। মুখ ভার।

(গ) পাঠশালা-পালিয়ে অনেকেই এসে জুটল ওই আমবাগানে।

(ঘ) শ্রীরামচন্দ্রের অভিনয় করে কখনও, কখনও শ্রীচৈতন্যের।

(ঙ) দাদার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এসে গঙ্গামাটি দিয়ে শিবমূর্তি গড়ে ছেলেটা।

৬। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) যেন আলো—বেরোচ্ছে—দেহ থেকে!

(খ) একসঙ্গে দু-তিনটি পালার—চলতে লাগল।

(গ) তন্ময় হয়ে—করছে।

(ঘ) এদিকে কিছুদিন বাদে—বন্ধ।

(ঙ) —করে এসে লাফিয়ে পড়ল।

৭। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) :—

(ক) যাত্রাদল কী?

(খ) 'বাউল' গান কী রকম?

(গ) হনুমান কে ছিলেন?

———



ঝড় বাদলের বন্ধু

খুব সরু একটি খাল, গ্রামের দক্ষিণদিকে। আর খুব রোগা একটি ছেলে ; থাকে ওই গ্রামেরই পশ্চিমদিকে। ছেলেটির সঙ্গে খালটির খুব মিতালি। কারণ, খালটি দেখতে বড়ো সুন্দর। তার ছু'পাশে রাশি রাশি গাছ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। ওরা একে অপরের হাত ধরে যেন। অথবা যেন একে অপরের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

সেখানে শুধুই সবুজের মেলা। বারো মাস তা জমজমাট। তাই সারা বছরই খালটা অন্ধকারে ডুবে থাকে। ছেলেটির খুব ভালো লাগে ঐ অন্ধকার। তাই স্কুল বা কলেজ থেকে প্রায় দিনই সরাসরি বাড়ী ফেরে না সে ; ফেরে তার এই অতি প্রিয় খালটিতে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে। বর্ষার জলে বেড়ানোর ধূম লাগে আবার।

ছেলেটি উতলা হয় আনন্দে। ছোট্ট ডিঙ্গি নিয়ে খালের ওপর দিয়ে তর্ তর্ করে এগিয়ে যায়।

বর্ষায় জলের অভাব নেই খালে। জলের দাপটে অনেক গাছও তখন ডুবুডুবু। ছেলেটির খুব ভাল লাগে ওদের দেখতে। দেখে আপন মনেই হাসে সে; হাসে আর ভাবে, আমার খুব প্রিয় সঙ্গী ওরা। ওদের কাছে পেলে জীবনটা কি যে সুন্দর হয়ে ওঠে!

ভাগীরথীর তীরে ছেলেটির আশায়-আনন্দ ভরা দিনগুলো গড়িয়ে চলে। গ্রাম থেকে নৌকো করে নদী পেরোয় সে, কলেজে যায়।

কলেজের ছুটো বিভাগ তখন, স্কুল ও কলেজ। ছেলেটি এই ছুটো বিভাগেরই ছাত্র ছিল, কৃতী ছাত্র। অধিকাংশ পরীক্ষাতেই বৃত্তি পেত সে। কিন্তু শুধুমাত্র পরীক্ষা আর পড়াশুনোয় তার মন বসলে তো! মন তার কত কী খুঁজত।

বৈশাখ মাস কবে আসবে? —এক-একদিন তন্ময় হয়ে ভাবে সে, কালবৈশাখীর ঝড়ে কবে শুরু হবে ভাগীরথীর নাচন?

নাচন ঠিক শুরু হয় এক-একদিন। বৈশাখের গোড়ায় সারা আকাশ জুড়ে ঝড়ো মেঘ দাপাদাপি করে।

ছেলেটি ছুটে গিয়ে মাঝিকে শুধায়,—নৌকো ছাড়বে?

মাঝি কখনও 'না' বলে না। বলে—'হ্যাঁ, ছাড়বো।'

নৌকো ছাড়া হয়; হয়তো বা ঝড়ও ওঠে। দেখতে দেখতে কালো মেঘে আঁধার হয় দিগন্ত। নদীর জল কালো হয়। আর উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে পড়ে নৌকোটা ছুলতে শুরু করে। কিন্তু নৌকারোহীর আনন্দ তখন দেখে কে! তার মনেও ঝড় তখন, খুশীর ঝড়। খুশী-মনেই প্রকৃতির সর্বনাশী মূর্তিকে দেখে সে।

কিন্তু সর্বনাশ যখন আসে, সত্যি যখন হাহাকার করে ওঠে মানুষ, তখন ছেলেটির চোখে জল দেখা দেয়।

একবার ফরাসডাঙ্গা থেকে ভাসান দেখে ফিরছে সে। হঠাৎ তার চোখে পড়ে একটি চিতা। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে সেখানে। একটি স্ত্রীলোক সেই আগুনে ঝাঁপ দিতে চাইছে। ছেলেটি মুহূর্তে বুঝে নিল, সর্বনাশ! আর বুঝতেই দু' চোখ জলে ভরে গেল তার। চোখের জলে আর একটি ভাসানের উদ্বোধন হল।

আর একবার। বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেট স্যার আসলা ইডেন এসেছেন ছেলেটির বাড়ীতে। এসে কাউকে কিছু না বলেই অন্তঃপুরে ঢুকেছেন। মেয়েরা ভয়ে চিৎকার করছেন।

সতেরো বছরের ছেলেটি শুনল এই চিৎকার। শুনে সোজা এগিয়ে গেল ইডেন সাহেবের সামনে : বললো,—সাহেব, আপনার সাহস তো বড় কম নয়! অনুমতি না নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছেন? লজ্জা হচ্ছে না?

শোনা যায়, সাহেব সত্যি লজ্জিত হয়েছিলেন সেদিন। ছেলেটির দৃঢ়তা দেখে অবাক হয়েছিলেন।

এদিকে ছেলেটির কিন্তু সাহিত্যের প্রতিও অনুরাগ ছিল খুব। মাত্র তেরো বছর বয়সে সংবাদ-প্রভাকরে সে কবিতা লিখত। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তার প্রথম কবিতা পড়েই মুগ্ধ। এ-সম্পর্কে সাময়িক-পত্রে মন্তব্যও করেছিলেন তিনি, 'উক্ত ছাত্রের বয়স অত্যল্প, কিন্তু এই পদ্য অতি প্রাচীন কবির রচনার ন্যায় উত্তম-রূপে রচিত হইয়াছে।'

প্রভাকরে কবিতা লিখে পুরস্কার পায় ছেলেটি এবং ঐ সাময়িক-পত্রেই সে দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারীর সঙ্গে 'কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধে' অবতীর্ণ হয়। কবিতা-যুদ্ধ বলতে কবিতার মাধ্যমে পরস্পরকে গালাগালি।

কিন্তু এই কিশোর ছেলেটি কে? ভাবীকালের এবং চিরকালের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রূপটি কি এই কিশোরের মধ্যে কল্পনা করা সম্ভব?

●

[**জীবন-কথা ঃ** 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের স্রষ্টা সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র জাতির শ্রদ্ধার পাত্র। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে চব্বিশ পরগণার কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক পাঠ গ্রামের পাঠশালায় গুরু-মহাশয়ের কাছে এবং তারপর পিতা যাদবচন্দ্রের কর্মস্থল মেদিনীপুরের জেলা-ইংরাজী স্কুলে। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে কাঁঠালপাড়ায় এসে তিনি হুগলী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে এন্‌ট্রান্স পাশ করেন। পর-বৎসর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বি. এ. পাশ করে গ্র্যাজুয়েট হন। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর-এর পদ গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সার্থক উপন্যাসই লিখলেন না, উপন্যাস-রচনার উপযোগী ভাষার সৃষ্টি করে বাংলাকে সমৃদ্ধ করলেন। তাঁর প্রথম দিককার উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ইত্যাদি রাতারাতি বাঙালীর হৃদয়-মন জয় করে নিল। তাঁর শেষ দিককার উপন্যাস 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ইত্যাদিতে লোকশিক্ষার প্রাধান্য। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনা বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি। দেশের জাতীয়, সামাজিক ও শিক্ষা-সম্পর্কিত উন্নতির জন্যে সারা জীবন ধরে এই দেশপ্রেমিক লিখে গেছেন। 'আনন্দমঠ'-এর, 'বন্দেমাতরম্' সমগ্র জাতিকে প্রেরণা দিয়েছে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর তিরোধান ঘটে।]

॥ অনুশীলনী ॥

১। 'ঝড়-বাদলের বন্ধু'টি কে? ঝড়ের দিনে ও কী করত?

২। 'সারা বছরই খালটা অন্ধকারে ডুবে থাকে'।—কেন অন্ধকার? ওখানে কে যেত? কী কারণে? গিয়ে কী কী করত?

৩। 'ঝড়-বাদলের বন্ধু নরম যেমন, গরমও তেমনি'—একটি করে উদাহরণ দিয়ে বলবে, কেন?

৪। কবিতা-যুদ্ধ কী? কে করত এই যুদ্ধ? কা'র কা'র সঙ্গে? তার কবিতা সম্বন্ধে কী জান?

৫। কোন্‌টি শুদ্ধ, কোন্‌টি অশুদ্ধ বলো। শুদ্ধর পাশে ✓ ও অশুদ্ধর পাশে × চিহ্ন দাও :—

(ক) বর্ষায় জলের অভাব নেই খালে।

(খ) বৈশাখের গোড়ায় সারা আকাশ জুড়ে সাদা মেঘ দাপাদাপি করে।

(গ) প্রভাকরে কবিতা লিখে তিরস্কৃত হয় ছেলেটি।

৬। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) :—

(ক) 'কালবৈশাখী' কা'কে বলে? দেখতে কেমন?

(খ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কে ছিলেন?

(গ) 'সাহিত্য-সম্রাট' কথাটির মানে কী?



তেরো বছরের মেয়ে। বড়ো ভালো।

তবে একটু যেন ভীতু। একা পুকুর-ঘাটে যেতে ভয় পায়। অথচ ঘাটে তো যেতেই হবে। গাঁ-ঘর বলে কথা। বাউন-গেরস্থের ঘর। পুকুরে গিয়ে না নাইলে কি চলে!

গেরস্থ-ঘরের বৌ যদি বলে. ঘাটে না গিয়ে ঘরে বসে থাকবো, তবে কি লাজে মাথা কাটা যায় না?

তেরো বছরের বৌটি ঘোমটা আরও একটু টেনে দিয়ে ভাবতে বসে।

কিন্তু হায় কপাল! ভাবনার যদি শেষ থাকত!—যদি ভেবে ভেবেই সুরাহা হ'ত সব কিছুর!

তাহলে উপায়?

বৌটি এবার উঠে পড়ে। খিড়কির ছোট দরজাটি দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। ভাবে, নতুন বৌ। নতুন এসেছি শ্বশুর-বাড়ীতে। কী করে একা নাইতে যাই ?

বৌটি আকাশ-পাতাল ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকেই আটটি মেয়েমানুষ নেমে এল যেন। অথবা যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল।

—কে গো তোমরা ? কোত্থেকে এলে ? —বৌটি শুধোয়।

কোন জবাব নেই। বৌকে শুধু পথে নামবার ইঙ্গিত করে ওরা।

নতুন বৌ ভালো মানুষ। মার-প্যাঁচ কিছু বোঝে না। তাই ইঙ্গিতে সায় দেয়। পথে নামে।

পথটা চলে গেছে পুকুর-ঘাটের দিকে। কিন্তু ঘাটে যেতে এ কী কাণ্ড! ওই আটটি মেয়েমানুষও নতুন বৌ-এর সঙ্গে সঙ্গে যে! চারজন বৌটির আগে আগে। আর বাকী চারজন পিছু পিছু।

—তা' বেশ, নতুন বৌ ভাবে,—ওরাও যদি আমার সঙ্গে নাইতে নামে তো ভালোই।

শেষ অবধি নাইল ওরা। নতুন বৌ-এর সঙ্গে ওরাও পুকুরে নামল। আবার নতুন বৌ ঘরে ফিরতে লাগল যেমন, ওরাও তেমন ফিরতে লাগল। ঠিক আগের মতোই বৌ চলল মাঝখানে ; আর ওরা চলল চার জন চার জন করে আগুপিছু।

কিন্তু চলতে চলতে হঠাৎ—

বাড়ীর কাছাকাছি এসে কোথায় যে গেল ওরা !

—তাই তো! গেল কোথায় ?—নতুন বৌ ভাবে একবার।

কিন্তু পরক্ষণেই সব আবার ভুলে যায়। ভিজে কাপড়টাতে সপ সপ শব্দ তুলে ঘরের দিকে এগোয়; ভাব দেখায়, যেন কিছুই হয়নি।

কিন্তু 'হয় নি' বললেই কি চলে? কিছু একটা ঠিক হচ্ছে। আর যদি না-ই হবে তো পরের দিনও আটটি মেয়ে আবার আসবে কেন? এবং কেনই বা ওরা নতুন বৌকে সঙ্গে নিয়ে আবার পুকুর-ঘাটে যাবে?

হ্যাঁ, পরের দিন এল ওরা। তার পরের দিনও। সেবারে নতুন বৌ যতদিন ছিল তার শ্বশুর-বাড়ীতে, ততদিন।

কিন্তু কে ওরা? কেন আসে, কেন যায়? নতুন বৌ অনেক ভেবেও হদিস পায় না। কিছুই বুঝতে পারে না।

আর একবার। ১২৭৮ সালে। নতুন বৌ আর নতুন নেই তখন; পুরনো হয়েছে। সতেরো পেরিয়ে আঠারোয় পা দিয়েছে। বাবার সঙ্গে চলেছে কলকাতায়।

কলকাতায় কেন? না, দোল-পূর্ণিমা—শ্রীচৈতন্যের জন্মদিন আসছে। সেদিন মহা ধূমধাম হবে ওখানে। বহু লোক গঙ্গায় নাইবে।

বৌটি কি তবে গঙ্গা-নাইবার জন্যে পাগল? পুণ্যি করবে বলে কলকাতায় আসছে?

না, মোটেই তা' নয়। সে কলকাতায় আসছে তার স্বামীর খোঁজে।

স্বামীটি কেমনতরো যেন। সেই যে চার বছর আগে 'আসছি' বলে বাড়ীর বাইরে বেরিয়েছেন তো বেরিয়েছেনই। আর তার দেখা নেই।

কিন্তু দেখা না হলে কি চলে? চুপ করে কি থাকা যায়? বৌটি আপন মনে ভাবে।

আপন মনেই কথা বলে; এবং মনই শেষ অবধি পথ দেখায় তাকে,—এক কাজ করো। ফিকির খোঁজো স্বামীর কাছে যাবার।

—কিন্তু কেমন করে খুঁজবো?

—কেমন করে আবার! যেমন করে সবাই খোঁজে।

—অর্থাৎ?

—সামনের দোল-পূর্ণিমায় বেরিয়ে পড়ো। তোমার বাবাকে নিয়ে কলকাতায় যাও। সেখানেই তো স্বামী আছেন!

—তা আছেন বটে! মনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বৌটি সত্যি একদিন বেরিয়ে পড়ে। বাবাকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটা-পথে কলকাতার দিকে এগোয়।

পথ বড় দুর্গম। বড় ভীষণ। শেষ হতে চায় না! অথচ এদিকে পা যে টলছে। মাথা ঘুরছে থেকে থেকে।

—বাবাকে বলব নাকি এসব? এই এতসব কষ্টের কথা? —মেয়েটি ভাবে।

—না, বলবে না সে; বলে বাবার কষ্ট বাড়াবে না,—নিজের মনে মনেই সে ঠিক করে।

—তাহলে? কী করবে সে? কেমন করে কলকাতা অবধি হাঁটবে? —অনেব ভেবেও সে কোনো থৈ পায় না।

ওদিকে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। মেয়েটি বেহুঁস হয়ে পড়ে দেখতে দেখতে।

বাবা ছোট্ট এক সরাইখানায় যান এবার। রাতের মতো কোনো-

রকমে আশ্রয় জোটান। কিন্তু আশ্রয়ে কী হবে! কিছুতেই হুঁস ফিরে আসে না মেয়ের। যন্ত্রণায় থেকে থেকে সে ছটফট করে।

যন্ত্রণা খুব যখন বেড়েছে, তখন এক মেয়ের কাছে আর এক মেয়ে হাজির। শেষে যে মেয়েটি এল, তার রঙ্ কালো।

—কে গো তুমি? জ্বরের ঘোরে আমাদের মেয়েটি ওকে শুধোয়। ও জবাব দেয়, তোমার বোন।

—বোন বটে! তাই বটে এসেছ! কিন্তু কোত্থেকে গো?

—কলকাতা থেকে। কলকাতায় যেখানে তোমার স্বামী থাকে, সেখান থেকে।

—স্বামীকে যে দেখবার ইচ্ছে আমার। সেবা করবার ইচ্ছে।

—বেশ তো! দেখবে। সেবাও করবে।

—না গো বোন! যা জ্বরে পড়েছি। আর বুঝি হল না।

—হল না কী গো! কে বলে, হল না? তুমি ভালো হবে; সেখানে যাবে, তাকে দেখবে।

—তাঁকে দেখবো? সত্যি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি। তোমার জন্যেই তো তাকে আটকে রেখেছি সেখানে।

—আটকে রেখেছ? —মেয়েটির যন্ত্রণা হঠাৎ অনেকখানি সেরে যায় যেন। আর ওদিকে কালো মেয়েটি ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

—ভারী সুন্দর তো তুমি দেখতে। —এতক্ষণে অনেকটা সেরে উঠেছে মেয়েটি। আর কালো বোনটি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে, সুন্দর বুঝি। তা' তুমিই কি কম সুন্দর!

—ধ্যেৎ! কি যে বলো। আমি আবার সুন্দর হলাম কখন?

—হলে সেই জন্ম থেকেই।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ, ঠিক তাই।

—আচ্ছা বোন, আর একটা কথা। তোমার হাত দু'টো এমন ঠাণ্ডা কেন গো? এমন নরম কেন গো? যেমন তুমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছ, অমনি সব ব্যথা যেন সেরে যাচ্ছে।

ব্যথা তো সারবেই। স্বয়ং কালী যদি ব্যথা সারাতে আসেন সারদা দেবীর, তবে তার সাধ্যি কী, না সেরে।

[**জীবন কথা :** ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে সারদামণির জন্ম জয়রামবাটী গ্রামে। পিতা রামচন্দ্র মুখোপোধ্যায়। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদাদেবীর বিয়ে হয়। সারদাদেবীও তাঁর স্বামীর মতোই ছিলেন ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি। তিনি কয়েকবার দক্ষিণেশ্বরে এসে নহবত ঘরে থেকেছেন; দিব্য-জীবনের মহিমায় ভক্তদের মুগ্ধ করেছেন নানাভাবে। ১৩২৭ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।]

॥ অনুশীলনী ॥

১। ভালো মেয়েটি কে? তার কালো বোনকে চেন? কেমন করে চেন, কোন্ ঘটনা থেকে, বলো।

২। ভালো মেয়ের পুকুরঘাটের সঙ্গী কা'রা? গল্প ক'রে সঙ্গীদের কথা কিছু বলো।

৩। নতুন বৌ কলকাতায় গেল কেন? কখন্, কা'র সঙ্গে এবং কেমন করে গেল?

৪। কোন্‌টি শুদ্ধ, কোন্‌টি অশুদ্ধ বলো। শুদ্ধর পাশে ✓ ও অশুদ্ধর পাশে × চিহ্ন দাও :—

(ক) ভিজে কাপড়টাতে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ তুলে ঘরের দিকে এগোয় ;

(খ) দোল-পূর্ণিমা—বুদ্ধদেবের জন্মদিন আসছে।

(গ) কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে।

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

(ক) একা — যেতে ভয় পায়।

(খ) বাবা ছোট্ট এক — যান এবার।

(গ) শেষে যে মেয়েটি এল, তার রঙ্‌ —।

৬। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) :—

(ক) শ্রীশ্রীসারদা দেবী কে ছিলেন ? সবাই কেন তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি করে ?

(খ) সারদা দেবীর জন্মস্থান কোথায় ? পুরো নাম কী ?

———



শহর কলকাতায় পড়ত সে। মিশনারী স্কুল সেণ্ট জেভিয়ার্সে। ওখানকার যারা পড়ুয়া তাদের বেশীর ভাগই ছিল সাহেবসুবাদের বাড়ির।

ওরা লেখাপড়ায় যেমন, আদব-কায়দাতেও তেমনি ওস্তাদ একেবারে।

কিন্তু ব্যাপার হয়ে ওঠে গোলমেলে। ওই ওস্তাদদের খপ্পরে একবার এসে পড়ে এক কাঠ-বাঙাল।

ছেলেদের আর পায় কে! ওরা সব ঐ বাঙালের পিছু লাগে।

একে ও নেটিভ, মানে ভারতীয়; তায় আবার কথায় কথায় বলে পূর্ববঙ্গের ভাষা। সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছেলেরা ওকে পেয়ে বসে।

—হ্যাল্লো! নেটিভ! —ছেলেরা ডাকবার নাম করে প্রায়ই ওকে বিদ্রূপ করে।

ও জবাব দেয় না কিছু। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

জবাব দেবেই বা কী! ও কি ছাই ভালো ইংরেজী জানে যে জবাব দেবে।

ওদিকে সাহেব ছেলেরা ক্ষেপে আগুন। 'হ্যাল্লো ফুল!' বা 'হ্যাল্লো ইডিয়েট' বলতে বলতে এক এক সময় যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

ছেলেটা অভিমান করে ওর বাবার ওপর। ভাবে,—বাবা যেন কী! যেন মিশনারী স্কুলে ছেলেকে ভর্তি না করলে চলত না। যেন ছেলে সাহেব না বনলে মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত।

কিন্তু না, এমন করে আর চলে না। দেখতে দেখতে 'নেটিভ' ছেলেটি ক্ষেপে ওঠে একদিন। হঠাৎ সে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সহপাঠীদের ওপর।

সহপাঠীরা তো ব্যাপার দেখে থ। কী হয়েছে, বুঝতে না বুঝতেই ওদের কয়েকজন রীতিমত ঘায়েল আর কি।

অন্যরা ঘায়েল হয় না বটে। 'সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ' করে কোনোক্রমে বাঁচে। কিন্তু এ ঘটনার পর থেকেই ম্যাজিক একেবারে! ছেলের দল একেবারে ঠাণ্ডা।

এরপর থেকে কোনদিন আর কেউ তাকে 'নেটিভ' বলে নি। ক্লাশের ছেলেরা বরং তাকে সমীহ করে চলেছে।

কিন্তু ক্লাশের সমস্যা মিটলে কী হবে। ওদিকে হোস্টেল নিয়ে ফ্যাসাদ।

ওখানে যারা থাকে, তাদের অধিকাংশই ছেলেটির চেয়ে বয়সে বড়; অনেক বড়। ওরা সব কলেজে পড়ে; অতএব, ওদের সঙ্গে সে খেলবে কী করে? কী করেই বা গল্প করবে? ছেলেটি তাই নতুন এক খেলায় মাতে। হোস্টেলের সামনেকার যে ফাঁকা জমিটা, সেখানে বাগান করতে লেগে যায়। আর বাগান মানে কি গাছ-গাছড়া বা লতাপাতা শুধু? শুধু দু'-চারটে বাহারী ফুলের গাছ?

না, তা' ঠিক নয়। বাগান বলতে ছেলেটি আরও অনেক কিছুকে বুঝত। যেমন, নদী থাকবে সেখানে, সেতু থাকবে, থাকবে জীবজন্তু আর পশু-পাখি।

ওদিকে পশু কেনা হয় অচিরেই। ছেলেটি হাত-খরচের পয়সা বাঁচিয়ে কয়েকটা খরগোস কেনে। এছাড়া, পাখিও এসে যায় দেখতে দেখতে। টিফিন-খরচের জমানো পয়সা থেকে আসে পায়রা।

কিন্তু নদী তখনও গড়ে ওঠেনি। ছেলেটি তাই ভীষণ ব্যস্ত। প্রতিদিন বিকেলে স্কুল থেকে ফিরেই নদী-গড়ার কাজে হাত দেয়; কোদাল অথবা শাবল চালায় মনের আনন্দে।

কিছুদিনের মধ্যেই গড়ে ওঠে নদী। আর ওদিকে গাছগুলোও দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠে। কিন্তু মুশকিল এই যে, যেমন-তেমন একটা নদী হলেই তো হল না। সে নদীতে স্রোত চাই। নদী হওয়া চাই জলে একেবারে ভরোভরো।

ছেলেটি জলের ব্যবস্থাও করে। পাইপ দিয়ে জল এনে ভরিয়ে দেয় নদী।

কী স্রোত সেই নদীতে! ছেলেটি নিজের কীর্তি দেখে নিজেই

অবাক এক এক সময়। ভাবে,—এক কাজ করা যাক। নদী পারাপারের জন্যে গড়া যাক গোটাকয়েক সেতু।

হ্যাঁ, শেষ অবধি সেতু সে গড়ে; কয়েকটাই; এবং ওই সব সেতুর ওপর দিয়ে খরগোসদের ছোটাছুটি করতে দেখে বার বার সে ভাবে,—যাক! বেচারাদের চলাচলের কষ্টটা অ্যাদ্দিনে দূর হল।

কিন্তু ওদিকে আবার নতুন বিপদ। পূজার ছুটিতে বাড়ী যেতে হবে তাকে; খরগোস আর পায়রাগুলো তখন থাকবে কোথায়?

ছেলেটি অনেক ভেবে ঠিক করে,— আমার সঙ্গেই থাকবে। পূজোয় ওরাও বাড়ী যাবে।

শেষ পর্যন্ত গেল ওরা বাড়ী। ছেলেটি ওদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

খরগোস আর পায়রারা ভাগ্যবান বলতে হবে। বছরে দু'বার করে ওরা ছেলেটির দেশে যেত। ট্রেনে চাপতো।

ওদিকে দেখতে দেখতে ছেলেটির এনট্রান্‌স্‌ বা প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে আসে। পড়ার চাপ দিন দিন বাড়ে।

যথাসময়ে সে পরীক্ষা দেয়। মোটামুটি কৃতিত্ব দেখিয়ে উত্তীর্ণও হয়, এবং তারপর ষোল বছর বয়সে গিয়ে ভর্তি হয় কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে।

ওই কলেজে বিজ্ঞান পড়াতেন ফাদার লাফ। পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো ছাত্রদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন তিনি; সব কিছুই ব্যাখ্যা করতেন জলের মতো সহজ সরল করে।

ছেলেটি অবাক হয়ে শুনতো সেই ব্যাখ্যা। ভাবতো,—এই তো

চাই! বিজ্ঞান যা' পড়বো, তা' বেশ ভালো করে বুঝে নেবো আগে ; এবং তারপর সাধ্যমতো পরীক্ষাও করবো।

বড় হয়ে সত্যি পরীক্ষা করল সে। পদার্থ ও উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে নতুন নতুন আবিষ্কারও করল। আর লোকে বললো,—অদ্ভুত এক বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। বিশ্বের দরবারে ভারতের গৌরব তিনি রাতারাতি বাড়িয়ে দিলেন।

●

[**জীবন-কথা** বিখ্যাত বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে পূর্ব-বঙ্গের (বর্তমান বাঙ্‌লাদেশের) মৈমনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা প্রথমে ফরিদপুরের গ্রামের বিদ্যালয়ে এবং পরে কলকাতায় সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল'ও কলেজে। ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যাণ্ড-যাত্রা, ১৮৮৫-তে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, ১৯১৫-তে অবসর-গ্রহণ। পদার্থ ও জীববিজ্ঞানে স্মরণীয় আবিষ্কারের জন্য জগদীশচন্দ্র বিশ্ববরেণ্য। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'বসুবিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।]

॥ অনুশীলনী ॥

১। 'বাগান বাগান খেলা' কে খেলত? কেমন করে? বুঝিয়ে বলো।

২। 'হঠাৎ সে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সহপাঠীদের ওপর'—'সে'টি কে? সহপাঠী কা'রা? ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণ? সহপাঠীরা শেষ অবধি কী করল?

৩। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কিশোর-জীবনের কয়েকটি ঘটনা বলো।

৪। কোন্‌টি শুদ্ধ, কোন্‌টি অশুদ্ধ বলো। শুদ্ধর পাশে ✓ ও অশুদ্ধর পাশে × চিহ্ন দাও :—

(ক) ছেলেটি হাত-খরচের পয়সা বাঁচিয়ে কয়েকটা খরগোস কেনে।

(খ) অদ্ভুত এক কবি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

(গ) টিফিন-খরচের জমানো পয়সা থেকে আসে পায়রা।

(ঘ) পূজোয় ওরাও বাড়ী যাবে।

(ঙ) সব কিছুই ব্যাখ্যা করতেন জলের মত সহজ সরল করে।

(চ) বছরে বারবার করে ওরা ছেলেটির দেশে যেত।

৫। প্রশ্নাবলী (মৌখিক)—

(ক) আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কে ছিলেন ? তিনি কীজন্যে বিখ্যাত ?

(খ) বসু-বিজ্ঞান-মন্দির কোথায় ?

(গ) জগদীশচন্দ্র ছাড়া অন্ততঃ দু'জন বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানীর নাম বলো।



স্কুল যেতে ভালো লাগেনা ছেলেটার, রাত জাগতে বা নির্জন বাড়িতে একা থাকতে ভালো লাগে।

—ওর হবে না কিছু। ওই স্কুল-পালানো ফাঁকিবাজটার কিচ্ছু হবে না, অনেকেই বলাবলি করে।

ছেলেটা কান দেয় না এসব কথায়, ভ্রূক্ষেপই করে না। বরং স্কুল-পালাবার নতুন ফিকির খোঁজে।

কখনও আবার দাদার সঙ্গে শিকারে যায় এবং গিয়ে কাণ্ড যা করে তা শুনলে অতি বড়ো শিকারীও বলবে, হ্যাঁ, ওস্তাদ বটে সে।

ওস্তাদ কেন? না, শিকারটা তার নতুন রকমের বলে। বাঘ

নয়, ভালুক নয়, শিকারে গিয়ে সে শুধুমাত্র লুচি-তরকারী ঘায়েল করে বলে। এদিকে দাদাও কম যান না। ঘায়েলে তিনিও ওস্তাদ। আর রক্তপাত ? এ কাজটিতে কার দক্ষতা বেশি ? দাদার না ভাইয়ের ? শোনা যায়, দুজনেই এ ব্যাপারে সমান দক্ষ ; এবং এত দক্ষ যে কোনো দিন একটি পাখিরও গা থেকে একবিন্দু রক্ত বের করে নি ওরা।

রক্তটা বেরোবে কোত্থেকে ? বন্দুক পাশে রেখে গড়াগড়ি দিলে কি আর শিকার হয় !

ছেলেটা ঐ এক রকমের। শিকার করতে গিয়ে গড়াগড়ি দেয় ; নয়তো ছাদে গিয়ে পায়চারি করে। কত রাত্রি আবার না ঘুমিয়ে কাটায় ! সে রাত জাগে নিজের খেয়াল-বশেই। ভাবে, সবাই যেটা করে তার উল্টো কিছু একটা করার মধ্যে মজা আছে।

রাত্তিরে ঘুমোয় তো সবাই। কিন্তু ক'জন তার মতো জেগে থাকে ? ক'জন তার মতো শুনতে পায়, গির্জার ঘড়িতে পনেরো মিনিট অন্তর ঘন্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং ঢং !

ওদিকে তেতলার ছাদে সারি সারি টব। টবের গাছগুলো বড়ো বড়ো। রাত-গভীরে ওদের সঙ্গে চাঁদের আলো আর আঁধার মিলে ভূতুড়ে আবহাওয়াটাও বেশ ভালোই জমে ওঠে।

ছেলেটার খুব ভালো লাগে ওখানে ঘুরে বেড়াতে অথবা ওখানে প্রেতের মতো ঘাপটি মেরে বসে থাকতে।

একবার। প্রেতের সঙ্গী হবার ভালো সুযোগ আসে। সাবরমতী নদীর তীরে নির্জন একটি প্রাসাদে সে একরকম একা থাকে তখন।

প্রাসাদটি বাদশাহী আমলের। সাবরমতী নদীটি তার গা ঘেঁষে। ছেলেটি এই নদী আর প্রাসাদ দেখে তো অবাক। ভেবে পায় না, এমন রহস্যময় নিরালা জায়গাও পৃথিবীতে আছে!

প্রাসাদের তিনতলার যে ঘরটিতে সে থাকে, সেখানে কান পাতলে হাজার মাইল দূরের শব্দও যেন শোনা যায়; হাজার বছর আগেকার কথাও যেন কানে আসে!

শোনা যায়, কথা শুনবে বলে এক এক সময় নাকি কান পাততো সে। কোনো কোনো সময় আবার নির্জন প্রাসাদবাড়ির ঘরে ঘরে একলা ঘুরে বেড়াত। সকাল দশটা নাগাদ দাদা কাজে বেরোতেন; অতএব বাড়িময় ঘুরে বেড়িয়ে অকাজ করার মস্ত সুযোগ হত তার। পায়রাগুলো কূজন করত। আর কী এক অজানা কৌতূহলে থেকে থেকে সে শিউরে উঠত।

জ্যোৎস্নারাতে তার আনন্দ দেখে কে! সতেরো বছরের ছেলেটি তখন সারা রাত জেগে। সেই বাদশাহী বাড়িটার দক্ষিণ দিকের প্রকাণ্ড ছাদটাতে একলা ঘুরে বেড়াতে ব্যস্ত।

কিন্তু এমন করে ঘুরে বেড়িয়ে বেশিদিন চলে না আর। দাদার নির্দেশে ওকে বোম্বে যেতে হয়। উদ্দেশ্য সাধু, বোম্বের পরিবেশে ইংরেজী শেখা।

ইংরেজী শেখাতো আন্না নামে একটি মেয়ে। ভারী সুন্দর। যেমন রূপে, তেমনি গুণে। বিলেত-ফেরত সে; বয়সে ছেলেটির চেয়ে কিছু বড়।

আন্নার অদ্ভুত মিষ্টি মনে হয়েছিল ছেলেটিকে। ওদিকে ছেলেটির মনে হয়েছিল, রূপে-গুণে আন্নার তুলনা নেই পৃথিবীতে।

ওকে প্রায়ই কবিতা শোনাত সে। আর নয়তো গান। গান শুনে আন্না মুগ্ধ।

একদিন আন্না ধরে বসে ছেলেটিকে,—তুমি আমায় নতুন কোন নামে ডেকো।

ছেলেটি বলে বেশ। তাই ডাকবো।

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে ওঠে, কই! ডাকো। নাম ঠিক করো।

ছেলেটি নাম ঠিক করে ফেলে তখনি। নতুন একটা নাম দেয় আন্নার। এবং তারপর নামটাকে নিয়ে কবিতা লেখে, গান বাঁধে।

গান শুনে আন্না অবাক। খানিকক্ষণ কথা সরে না তার মুখ দিয়ে।

কিছুদিন বাদে। ইংল্যাণ্ডের সমুদ্রতীরে যায় ছেলেটি। সমুদ্রতীরবর্তী টর্কি শহরের দিনগুলো দেখতে দেখতে কেটে যায়। কখনও পাহাড়ে, ফুল-বিছানো প্রান্তরে, পাইন-বনের ছায়ায় ঘুরে বেড়ায় সে; কখনও আবার চুপচাপ বসে থাকে; টর্কিতে সমুদ্রের উপর ঝুঁকেপড়া একটি পাহাড়ের উপর বসে বসে কী যেন লেখে।

—খুব ভাবুক ছেলে যা হোক, আশেপাশের অনেকেই মন্তব্য করে এবার। ছেলেটি কিন্তু এসব কথায় কান দেয় না। কারণ, সে সব সময় চায় নিজের খুশিমাফিক চলতে। অবশ্য দরিদ্রকে খুশি করতে পেলেও খুবই আনন্দ হয় তার।

একবার। দারুণ শীত পড়েছে। টন্‌ব্রিজ ওয়েল্‌স্‌ শহরের রাস্তা দিয়ে চলেছে সে। চলতে চলতে হঠাৎ দেখে, রাস্তার ধারে একজন কে দাঁড়িয়ে। ছেঁড়া জুতোর ভিতর দিয়ে তার পায়ের

খানিকটা দেখা যাচ্ছে। মোজা নেই তার। বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা ইংল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ বলে ছেলেটিকে সে কোনো কথা বলে না, কেবল মুহূর্তের জন্যে তার মুখের দিকে তাকায় ফ্যাল ফ্যাল করে। ছেলেটির দয়া হয় ওকে দেখে, দুঃখ হয়। তাই তখুনি সে ওকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দান করে। লোকটি তো অবাক। এত বড় দান জীবনে কোনোদিন সে পায়নি। স্বর্ণমুদ্রা কোনোদিন কেউ তাকে উপহার দেয়নি। তাই তাড়াতাড়ি সে ছুটে আসে ছেলেটির কাছে ; বলে, দেখুন ! বোধ হয় ভুল হয়েছে। ভুল করে এই স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছেন আপনি।

ছেলেটি জানায়,—না, ভুল হয়নি। জেনেশুনেই দিয়েছি। ওটা আপনারই।

বলে কি ছেলেটা ? লোকটি এবার আর কথা বলতে পারে না ; ধীরে ধীরে টন্‌ব্রিজ ওয়েলস্‌-এর পথ ধরে এগোয়।

ওদিকে দিন এগোয় ছেলেটারও। ঠিক এমনি করেই মানুষ আর প্রকৃতিকে ভালোবেসে গান আর কবিতা লিখে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে সে।

সত্যি বড় হয় ছেলেটা ; অনেক অনেক বড় এবং লোকে বলে, এর মতো বড় কবি—এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো মহৎ কবি পৃথিবীতে খুব অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন।

[**জীবন-কথা :** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা বা ভারতেরই শুধু নন, সর্ব-দেশের সর্ব-কালের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। কবিতায় ও গানে যেমন, গল্প-উপন্যাস প্রবন্ধ ভ্রমণ-কাহিনী নাটক ইত্যাদি রচনার ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি সমান পারদর্শী।

জন্ম ১২৬৮ বঙ্গাব্দের (১৮৬১ খ্রীঃ) ২৫শে বৈশাখ কলকাতায়। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মাতা সারদা দেবী। ছেলেবেলায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারী, সেণ্ট জেভিয়ার্স প্রভৃতি স্কুলে পড়াশুনায় মন না বসায় বাড়িতেই তাঁর পড়ার আয়োজন হয়। শিশুকাল থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ-এর সঙ্গে বিলেত যান ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে; কিছুকাল ব্রাইটন পাবলিক স্কুলে পড়ে লণ্ডন আসেন। সেখানকার পাঠক্রম শেষ না করেই দেশে ফেরেন ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে। সাহিত্য-সাধনা এরই মধ্যে পুরো দমে শুরু হয়েছে। ক্রমে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে কেন্দ্র করে তা আরও পরিণতির দিকে এগোল; সকলে মুগ্ধ হল রবি-কবির প্রতিভায়। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বোলপুরে এসে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নামে আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। আজ তা শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী নামে পরিচিত। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থটি রচনার জন্য ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এরপর থেকে তাঁর বিশ্ব-বিজয়ের পালা। তিনি দেশে দেশে ঘুরেছেন, নতুন নতুন গ্রন্থ রচনা করেছেন, ভারতের আদর্শ বিশ্বমৈত্রীর কথা বিশ্ববাসীর কাছে প্রচার করেছেন। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের (১৯৪১) ২২শে শ্রাবণ তাঁর তিরোধান ঘটে।]

অনুশীলনী

১। স্কুল-পালানো ছেলেটি কে? কেন ও রাত জাগত? জেগে থেকে কী লাভ হ'ত ওর?

২। ছেলেটা স্কুল পালাত কেন? কেনই বা শিকারে যেত? ওর শিকারের কথা কিছু জান?

৩। 'একবার। প্রেতের সঙ্গী হবার ভালো সুযোগ আসে'।—এখানে কা'র কোন্ সুযোগের কথা বলা হয়েছে?

৪। স্কুল-পালানো ছেলেটি বোম্বেতে কী করত? লেখাপড়া, না অন্য কিছু?

৫। 'মানুষ আর প্রকৃতিকে ভালোবেসে, গান আর কবিতা লিখে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে সে।'—'সে' বলতে কে? মানুষ আর প্রকৃতিকে ও যে ভালবাসত, তার প্রমাণ?

৬। শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) শিকার করতে গিয়ে—দেয়।

(খ) প্রাসাদটি—আমলের।

(গ) —ছায়ায় ঘুরে বেড়ায় সে;

(ঘ) ইংরাজী শেখাতো—নামে একটি মেয়ে।

(ঙ) —অদ্ভুত মিষ্টি মনে হয়েছিল ছেলেটিকে।

(চ) —সমুদ্রতীরে যায় ছেলেটি।

(ছ) —কোনোদিন কেউ তাকে উপহার দেয়নি।

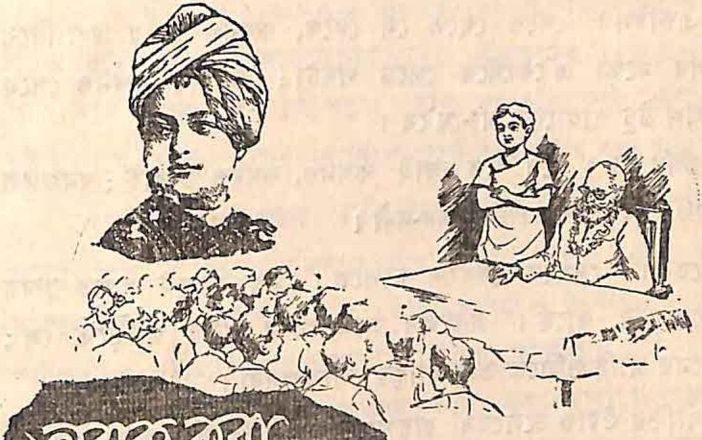
৭। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) ঃ

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে ছিলেন? তাঁর যে-কোনো একটি কবিতার নাম বলো।

(খ) বোম্বে কোথায়?

(গ) 'শিকার' কী জিনিস? অন্তত: একটি শিকারের গল্প বলো।

———



অবাক করা ছেলে

১৮৮৭ সাল। রেল লাইন তখনও সারা দেশে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে পড়েনি। তখনও যাতায়াতের সুবিধে হয়নি আজকের মতো। সে যুগে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর শহরে গরুর গাড়িতে যেতে হত। গাড়ি যেত নাগপুর থেকে ; যেতে সময় লাগত পনের দিনেরও বেশি।

তা লাগুক। এ-নিয়ে চৌদ্দ বছরের এক ছেলের মাথাব্যথা নেই। ও বলে, সময় না লাগলে সব কিছু কি দেখা হয় ?

বড়োরা এ-কথায় অবাক। এ ওর মুখের দিকে তাকান। ছেলেটিকে বোঝাতে যান কেউ কেউ, সব কিছু কি আবার দেখবে ? ওপথে দেখবার আছেটা কী ?

ছেলেটি জবাব দেয়,—শুনেছি, অনেক কিছু। বন-পাহাড় আছে, নদী-নালা আছে, আরও আছে কত কী!

একদিন। যেতে যেতে সে দেখে, কখনও বনের মধ্য দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে গেছে পথটা; আবার কখনও গেছে আকাশ-উঁচু পাহাড়ের গা-ঘেঁষে।

দুর্গম পথ! সে পথে চড়াই কখনও, কখনও উৎরাই; বনজঙ্গল কখনও, কখনও পাহাড়ীয়া নদ-নদী।

ছেলেটি দেখতে দেখতে চলেছে। সব কিছুই অদ্ভুত সুন্দর ঠেকছে তার কাছে। সকলের সামনেকার গরুর গাড়িতে সে; পেছনের গাড়িগুলিতে তার বাড়ির লোকজনরা।

বাড়ির ওঁরাও চলেছেন রায়পুরে। বাড়ির কর্তা কাজ করবেন ওখানে। তাই সবাইকে স্থান-বদল করতে হচ্ছে।

কর্তা আগেই পৌঁছে গেছেন। অন্যদের কয়েকদিন পরে পৌঁছুবার কথা। ওঁদের নিয়ে যাবার ভার ছেলেটির ওপর। তাই খুশিতে সে আটখানা। বার বার তার মনে হয়, এমন সুন্দর সব দৃশ্য দেখতে পেলে সারা জীবন সে অন্যদের পৌঁছে দেবার ভার বইতে পারে।

কিন্তু এ সংসারে কে কার ভার বয়?—ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একসময় তন্ময় হয় ছেলেটি। তার চোখ পড়ে সামনেকার পর্বত-গুলোর ওপর।

—আশ্চর্য! আশ্চর্য ওরা! এই বিন্ধ্যপর্বতের চূড়াগুলো আশ্চর্য সুন্দর!—সে ভাবতে থাকে,—ওরা আকাশকে ছুঁয়ে। নানা গাছপালায় ঢাকা। অসংখ্য ফুলেফলে ভরা। ওদের গায়ে

গায়ে লক্ষ পাখির কলকাকলী ; উড়ছে কেউ, কেউ বা পর্বতের গায়ে নেমে দাপাদাপি করছে।

ওদিকে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে গরুর গাড়ি। ছেলেটিকে অদ্ভুত এক শান্তি ঘিরে ধরেছে। সামনেকার দুটো পর্বতশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে তার মনে হচ্ছে, যেন দুটি বন্ধু। হাত ধরাধরি করে চলছিল ; হঠাৎ থেমে গেছে। যেন বনপথকে স্পর্শ করে হঠাৎ ওরা স্তব্ধ।

ওদেরই গা-ঘেঁষে গরুর গাড়ি চলে এবার। ছেলেটি তাকায় ওদের দিকে। বিস্ময়ে হতবাক সে। দেখে, ওদের একটির গায়ে রাক্ষুসে ফাটল, পর্বতের চূড়া থেকে পাদদেশ অবধি। সমস্ত ফাটলটাকে লম্বালম্বিভাবে জুড়ে বিরাট এক মৌচাক।

—এত বড় মৌচাক ? কেমন করে এল এখানে ?—ছেলেটি নিজের মনকেই প্রশ্ন করে, কে গড়ল এটা ? কত কোটি মৌমাছি কত যুগের সাধনায় এটা গড়ে তুলল ?

ভেবে ভেবে থৈ পায় না সে। প্রশ্ন করে, শুধু কি মৌমাছির কারসাজি এ ? না কি এর পেছনে অন্য কোন শক্তি ?

কী সে শক্তি ? কা'র শক্তি ?—ছেলেটি এবার অন্য জগতে চলে যায় যেন। নিজেকেই শুধোয় বার বার করে, কার শক্তি ? ঈশ্বরের ? কে এই ঈশ্বর ? কোথায় থাকেন ? দেখতে কেমন ?

ভাবতে ভাবতে আকুল হয়ে ওঠে সে। জানতে চায়, তবে কি এই বিরাট মধুচক্রের পেছনে ঈশ্বর ?

ঈশ্বর ! মধুচক্র ! কী আশ্চর্য ! দেখতে দেখতে সমস্ত পৃথিবী-টাই মধুচক্র হয়ে ওঠে যে ! বিশ্বভুবন জুড়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই যে অবশিষ্ট থাকে না !

তবে? সবই কি ঈশ্বরের লীলা? করুণাময় ভগবানের কারসাজি? ভগবান! ভগবান!—করুণাময়ের কথা ভাবতে ভাবতে ছেলেটি সমাধিস্থ হয়। কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার মনে হতে থাকে, মৌমাছিদের আদি-অন্ত খুঁজে বের করবে বলে সে যেন ভগবানের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে।

ভগবান! ভগবান!—খানিকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পায় ছেলেটি। মধুচক্রের খোঁজে চোখ মেলে ফিরে তাকায়।

কিন্তু কোথায় মধুচক্র! গাড়ি তখন তাকে পেছনে ফেলে অনেক দূর চলে এসেছে। তখন অন্য এক বনপথ ধরে চলেছে ছেলেটি। একা চলেছে।

গাড়িতে একাই ছিল সে; তার জ্ঞান-হারাবার কথা অন্য কেউ তাই জানতে পারে নি।

অবশ্য জানলেই বা কী হ'ত? জ্ঞান হারিয়ে কোন্ রাজ্যে সে চলে গিয়েছিল, তার কি ঠাওর পেত কেউ?

মানুষের মনের খবর পাওয়া কি সোজা কথা! তাছাড়া, ছেলেটি মন-হরণের খেলা খেলত যে! অনেককেই অবাক করে দিত তার অদ্ভুত আচার-আচরণে!

রায়পুরে চৌদ্দ বছরের এই ছেলেটি চল্লিশ পেরিয়ে যাওয়া বয়স্কদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিত। আলোচনা চলত বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে! সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন কোন কিছুই বাদ থাকত না। বয়স্করা ছেলেটির বাবার কাছে আসতেন, কিন্তু কথা বলতেন ছেলেটির সঙ্গে। অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা—বিজ্ঞানের নতুন কোনো আবিষ্কার নিয়ে কখনও। কখনও সাহিত্য বা দর্শন নিয়ে।

একদিন এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে অবাক। সাহিত্যিক জানলেন, প্রায় সব বাংলা বই সে পড়ে ফেলেছে।

—বলো কী ! সব পড়েছ ?

—হ্যাঁ, প্রায় সব।

—কিন্তু এই বয়সে এত বই তুমি পড়লে কী করে ?

ছেলেটি জবাব দেয় না এইবার। চুপ করে থাকে।

সাহিত্যিক বলেন,—বুঝেছি, তুমি অসাধারণ। তোমাকে নিয়ে বাংলা ভাষা একদিন গর্ব করবে।

—কিন্তু গর্ব কি বাংলা ভাষাই শুধু করবে ? বাংলা দেশ নয় ?

ছেলেটির জন্মস্থান কলকাতায় অনেকে বলাবলি করত। ষোল বছরের স্বাস্থ্যবান তরুণটির দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করত কেউ কেউ, বড় হয়ে ও একজন নামকরা বক্সার হবে। এই তো সেদিন ; বক্সিং-এ প্রথম হয়ে মেডেল পেল।

ও যে ব্যায়াম-বীর ! ডন-বৈঠক, ঘুষোঘুষি, সাঁতার, ব্যাট-বল সব কিছুতেই ওস্তাদ যেন।

ওদিকে খেলাধূলায় যেমন লেখাপড়ায়ও তেমনি সে। রায়পুর থেকে ফিরে এসে তিন বছরের পড়া ও এক বছরে তৈরি করল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় করল ভালো ফল।

ও একবার পড়লেই সব মনে রাখতে পারত। প্রবেশিকা-জ্যামিতির সবটাই ও তৈরি করেছিল মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায়।

ওদিকে বক্তৃতায় সুরেন বাড়ুজ্যেকে সে হারিয়ে দেয় বুঝি !

একদিন। স্কুলের এক প্রবীণ মাষ্টারমশাইকে বিদায়-অভিনন্দন

জানানো হচ্ছে। মাষ্টারমশাই অবসর গ্রহণ করছেন, তাই এ অভিনন্দন। অভিনন্দন-সভার সভাপতি দেশবরেণ্য স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা স্থরু হয়েছে। এবার ছাত্রদের মধ্য থেকে কেউ গিয়ে মাষ্টারমশাইয়ের গুণাবলী বর্ণনা করবে। কিন্তু যেতে সাহস হয় না কারও। সবাই বলে,—আমি নয়, আমি নয়, আর কেউ যাক।

কিন্তু কে যাবে! স্থরেন বাড়ুজ্যের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে পারে, এমন বুকের পাটা কার আছে?

শেষ অবধি দেখা গেল, সারা স্কুলের মধ্যে একটি মাত্র ছেলের আছে বুকের পাটা। সে সভাস্থলের দিকে এগিয়ে গেল বীরদর্পে। গিয়েই ইংরেজীতে বক্তৃতা স্থরু করল। আধঘণ্টা ধরে অনর্গল বলল সে এবং তার বলার শেষে স্থরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করলেন, এমন তেজস্বী কণ্ঠস্বর, এমন দৃপ্ত বক্তৃতা জীবনে আমি খুব অল্পই শুনেছি। এ ছেলে পৃথিবীর লোককে মুগ্ধ করবে একদিন।

কে এই ছেলে? চলনে-বলনে, আচারে-আচরণে, খেলায়-ধূলায় সর্বত্র যার অসাধারণত্বের ছাপ? এই ছেলেটি কে?

এর ঘরের নাম নরেন্দ্রনাথ, আর বাইরের নাম স্বামীজী।

ঘরে-বাইরে সবাই আজ এঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বলে জানে।

●

[**জীবন-কথা ঃ** বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ত্যাগে ও মহিমায় সমগ্র পৃথিবীর গৌরবের ধন। পূর্বনাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। জন্ম কলকাতায়, ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত, মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। শৈশবে তিনি পিতামাতার নিকট ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় পান; পরে সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার

সঙ্গে সঙ্গীত ও ব্যায়ামেও দক্ষ হন। যৌবনে ব্রাহ্মসমাজ ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ; পরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর শিষ্য হন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর তিনি অন্যান্য গুরুভাইদের সহযোগিতায় বরানগরে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেন। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসম্মেলনে তিনি হিন্দু-ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সেখানে উপস্থিত সকলকে তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ করেন। তারপর ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানা জায়গায় ভ্রমণ ও শাস্ত্র-আলোচনা করে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বদেশে ফেরেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র উদ্দেশ্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। বিবেকানন্দের মতে, ত্যাগ ও বৈরাগ্যই ভারতের সনাতন আদর্শ। সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে সমাজ-সেবাই মুক্তির পথ। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে বেলুড় মঠে তিনি দেহত্যাগ করেন।]

॥ অনুশীলনী ॥

১। 'অবাক করা ছেলেটি কে? নাগপুর থেকে রায়পুরে যেতে সে কী দেখল? কী ভাবল? শেষ পর্যন্ত কী হল ওর?

২। 'তাছাড়া, ছেলেটি মন হরণের খেলা খেলত যে।'—এখানে কা'র কী ধরনের খেলার কথা বলা হয়েছে? আচার-আচরণে, খেলাধুলায় এবং লেখাপড়ায় কেমন করে সে সকলের মন হরণ করত?

৩। 'এ ছেলে পৃথিবীর লোককে মুগ্ধ করবে একদিন।'—কে বলেছিলেন? কেন?

৪। 'তোমাকে নিয়ে বাংলা ভাষা একদিন গর্ব করবে।'—কে বলেছিলেন? কা'কে? কেন?

৫। 'অবাক করা ছেলেটি'র যে কোনো দুটো কীর্তি গল্প করে বলো।

৬। কোন্‌টি শুদ্ধ, কোন্‌টি অশুদ্ধ বলো। শুদ্ধর পাশে √ ও অশুদ্ধর পাশে × চিহ্ন দাও :—

(ক) ১৮৭৭ সাল। রেললাইন তখন সারা দেশে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে।

(খ) প্রায় সব বাংলা বই সে পড়ে ফেলেছে।

(গ) গিয়েই বাংলায় বক্তৃতা সুরু করল।

৭। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) :—

(ক) স্বামী বিবেকানন্দ কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর গুরু কে?

(খ) বিবেকানন্দের কিশোর-জীবনের যে-কোনো একটি 'অবাক-করা' ঘটনার কথা বলো।

(গ) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা কে? বেলুড় মঠ কোথায়?

———



যেই আলো নিভল ঘরের, অমনি চিৎকার করে উঠল সে, ভূত ভূত !

কিন্তু কোথায় ভূত ? পাশের ঘরেই ছিল তার দাদা। চিৎকার শুনে ছুটে এসে বললো, ভূত কোথায় ?

—ওই যে ! সামনের ওই গাছটার ডগায় !

—ধ্যেৎ ! গাছের ডগায় তো চাঁদের আলো।

—চোর ! চোর ! —এক একদিন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বন্ধুদের হাসির খোরাক যোগায় ছেলেটা।

—কিন্তু কোথায় চোর ?—বন্ধুরা জানতে চায়।

—এই যা ! ভুল হয়ে গেল !—আপসোস করে ছেলেটি। বলে, তাও তো বটে, চোর তো নেই ! কী জানো, তোমাদেরই

চোর ভেবেছিলুম। এই ভর-সন্ধ্যেতে পা টিপে টিপে তোমরাই আসছিলে কিনা!

খানিক বাদে, বন্ধুরা পা টিপে টিপেই বাড়ি চলে যায়। কিন্তু ছেলেটার ভয় আর যায় না।

—ওরা আসছে! রাত একটু গভীর হলেই সে ভাবে।

—সাপ! সাপ!—এক একদিন বাড়িশুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙায় সে। তারই মশারির ওপর পড়ে থাকা দড়িটাকে ভয়ঙ্কর একটা বিষধর গোখরো বলে ভুল করে।

—এক কাজ করা যাক, একদিন ঠিক করে সে, আলো জ্বেলে কাটিয়ে দেয়া যাক রাতটা।

সেই থেকে জ্বলে আলো। রাতে আলো না হলে ওর ঘুম হয় না।

—আমার আবার উল্টো,—ছেলেটির বউ বলল একদিন, ঘরে আলো জ্বললে আমি আবার ঘুমোতে পারি না।

—তাহলে? উপায়!—ছেলেটি আপন মনেই ভাবে।

ভাবে, বড় ভুল হয়ে গেছে। মাত্র তেরো বছর বয়সে বিয়ে করা ঠিক হয়নি। এখন এই বাচ্চা মেয়েটাকে দেখে ভূত না আরও বেশী করে হামলা শুরু করে!

কিন্তু মেয়েটা ভীষণ সাহসী। ঘুটঘুটে আঁধারেও একা বাইরে যেতে ভয় পায় না। যখন-তখন সাপ-সাপ বলে চেঁচায় না এবং এসব কিছুর চেয়েও বড় কথা, চোরকে পরোয়াই করে না। চোরের কথা উঠলেই বলে, ঘাবড়াও মৎ। দেবো ব্যাটাদের ঠেঙিয়ে।

—কী সর্বনাশ ! চোরকে ঠ্যাঙানো কি সোজা কথা ! ছেলেটি আকাশ থেকে পড়ে যেন। ভাবে, বাচ্চা বউটার এই সব অলুক্ষণে কথা চোররা আবার শুনতে পায়নি তো ?

—যদি শোনে ? যদি ওরা নিশুতি রাতে ঘরে এসে চড়াও হয় ? —ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে ওঠে সে।

—আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না ? বউকে ভয়ের কথাটা একদিন বুঝিয়ে বললে হয় না ?—ছেলেটি আপন মনেই গুনগুন করে এক একদিন। বউকে সব কিছু খুলে বলবে বলে সে এগিয়েও যায়। কিন্তু আসল কথাটা কিছুতেই আর বলা হয় না।

আসল কথা কোন্ আক্কেলে বলবে ? কথা শুনে বউ যদি ওকেই ভূত ভাবে ?

—তুই শুধু ভূত নোস, ভীতুও ! ছেলেটার এক বন্ধু একদিন কাটা ঘায়ের ওপর নুনের ছিটে দেয়। ছেলেটা আমতা আমতা করে, কেন ? কী আবার করলাম ?

—করিস নি কিছু, এবং সে-জন্যেই তুই ভীতু।

—ভীতুকে কী করতে হবে ?

—মাংস, শুধু মাংস খেতে হবে কয়েকবার।

—মাংস ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মাংস।

—কিন্তু আমরা যে বৈষ্ণব। আমাদের বংশে কেউ যে কোনদিন ও জিনিস ছোঁয়নি।

—ছোঁয়নি বলেই তো তোকে ছুঁতে হবে।

—কিন্তু আমি কি পারবো ?

—পারতেই হবে। ইংরেজদের দিকে ছ্যাখ; কী তেজী ওরা! মাংস খায় বলেই না এত ওদের তেজ!

—তা বটে! ইংরেজরা তেজী বটে!—ভীতু ছেলেটি সায় দেয় এবং শেষ অবধি মাংস খেতে রাজীও হয়।

তারপর একদিন নিরিবিলিতে এক নদীর ধারে গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে মাংস খেয়ে আসে। কিন্তু খেয়ে আর এক বিপদ। রাত্তিরে বার বার ঘুম ভেঙ্গে যায় ওর। বার বার মনে হয়, ওর পেটের মধ্যে একটা পাঁঠা কেবলই চেঁচাচ্ছে।

মাংস-খাবার ব্যাপারটা কয়েকদিনের মধ্যেই অবিশ্যি গা-সহা হয়ে গেল। দেখতে দেখতে আরও কয়েকবার ওই নিষিদ্ধ জিনিসটি খেল সে।

কিন্তু নিষিদ্ধ জিনিস কি সংসারে একটা? সিগারেট নামক পরম উপাদেয় জিনিসটি কি ছোটদের কাছে নিষিদ্ধ নয়?

—আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?—ছেলেটা একদিন ঠিক করে, কাকার ফেলে দেয়া সিগারেটের টুকরোগুলো কাজে লাগানো যায় যদি?

—ওদের কাজে লাগালে সত্যি কাজের মত কাজ হয় একটা!—ছেলেটির এক আত্মীয় একদিন পরামর্শ দেয় এবং তারপর থেকেই শুরু হয় ওদের সিগারেট খাওয়া।

—কিন্তু ফেলে দেয়া ওই টুকরোগুলো টেনে কি খুব একটা মজা আছে!—ছেলেটার মধ্যে অশান্তি দেখা দেয় এইবার। সে ভাবে, আস্ত সিগারেট টেনে শান্তি পেতে হবে।

কিন্তু সিগারেট কিনবার পয়সা কোথায়?

আত্মীয়টিরও মাথায় হাত।

শেষ পর্যন্ত পয়সা অবিশ্যি জুটে যায়। বাড়ির চাকরের পকেট থেকে চুরি করে ওরা।

কিন্তু চাকরের পকেট কত বড় আর! পয়সা কত আর থাকতে পারে ওখানে! তাই অচিরেই পয়সা ওদের ফুরিয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে বন্ধ হয় সিগারেট খাওয়া।

—এখন উপায়?—ছেলেটি নতুন কোনো পথ খুঁজে পাবার আশায় আত্মীয়টির দিকে তাকায়। আত্মীয়টি বলে, উপায় আর কিছু নেই। পথ খুঁজে পাচ্ছি না কিছু।

ছেলেটি হাহাকার করে ওঠে, এমন জীবন রেখে তবে লাভ?

আত্মীয়টি সায় দেয়—ঠিক কথা! সব কিছুতেই বড়দের নিষেধ মেনে চলে লাভ?

লাভ-লোকসানের হিসেব কষতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ওরা দুজনে মিলে আত্মহত্যা করবে বলে ঠিক করে। ঠিক হল, ধুতরোর বীজ খাবে।

কিন্তু বিষ ওরা খেতে পারে না শেষ অবধি। যতটুকু খায়, তা দিয়ে আর যা কিছুই হোক না কেন, আত্মহত্যা নামক বিদঘুটে কাজটা হয় না।

এদিকে আত্মহত্যার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সিগারেটের ওপর ঘেন্না ধরে যায় ওদের। ওরা ঠিক করে, জীবনে আর ও জিনিসটি ছোঁবে না।

কিন্তু সিগারেট না ছুঁলে কী হবে! একদিন অন্য একটা জিনিসের দিকে তাকিয়ে ছেলেটার মন কেমন যেন উড়ো-উড়ো হয়ে যায়।

একবার দাদার একটি সোনার জিনিসের দিকে চোখ পড়ে তার এবং সে ঠিক করে, সে জিনিসটা থেকে কিছু সোনা সে চুরি করবে।

চুরি সে শেষ পর্যন্ত করলও। কিন্তু চুরির ধন নিজে নিল না; সেটা দিয়ে দাদারই কিছু ঋণ শোধ করল।

ওদিকে চুরি করে অবধি দারুণ অশান্তি হচ্ছে তার। সে বার-বারই ভাবছে, কাজটা অন্যায় হয়ে গেল।

—এক কাজ করলে হয় না!—সে স্থির করে শেষ অবধি, বাবার কাছে গিয়ে দোষটা স্বীকার করলে হয় না!

বাবা তখন দারুণ অসুস্থ। শয্যাশায়ী বলতে গেলে। কিন্তু তবু সে একদিন তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর হাতে একটি কাগজ গুঁজে দিল।

বাবা কাগজ পড়ে তো অবাক। ওতে লেখা ছিল, 'আমি দাদার কাছ থেকে সোনা চুরি করেছি। আমায় শাস্তি দিন'।

বাবা শাস্তি দিতে পারলেন না। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর চোখ দিয়ে যে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল, তা দিয়েই ছেলেটার আসল শাস্তি হয়ে গেল। সে প্রতিজ্ঞা করল, জীবনে আর কোনদিন চুরি করবে না।

এই ঘটনার পর থেকেই বাবার সেবা-শুশ্রূষা নিয়ে মেতে উঠল সে। আর মাতল ভূত-তাড়াবার কাজে। রম্ভা নামে একটি নার্স ওকে বললেন, রাম নাম করো। ভূতের ভয় দূর হবে।

সেই থেকে রাম নাম করে ছেলেটা। সারা জীবন ধরে করে এবং রাম নাম করতে করতেই একদিন—

একদিন সারা পৃথিবী আর্তনাদ করে ওঠে, কী হল?

আকাশে-বাতাসে গুঞ্জরিত হয়, তিনি চলে গেলেন। রাম নাম করতে করতে চলে গেলেন মহাত্মা গান্ধী। প্রার্থনা সভায় কে নাকি তাঁকে গুলি করেছে!

●

[**জীবন-কথা :** স্বাধীনতা-সংগ্রামে ও সমাজ-কল্যাণে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। জন্ম ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২রা অক্টোবর, গুজরাটের পোরবন্দরে। জাতিতে তিনি গান্ধী বা মুদী। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা রাজকোটে। তেরো বৎসর বয়সে কস্তুরবা-র সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার পর ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে বিলেত যান। ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফেরেন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি আফ্রিকা যান। একুশ বৎসর দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটিয়ে এবং সেখানকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে দেশে ফেরেন। এরপর ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে বিহারের চম্পারণে সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন। ঐ বছরেই আমেদাবাদে শ্রমিক-আন্দোলনে তিনি সহযোগিতা করেন। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটে অজন্মার পর জমির খাজনা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এছাড়া রাউলাট আইন ও খিলাফতের প্রতিকারকল্পে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে, খাদির মাধ্যমে গ্রামে গঠনকর্ম বিস্তারে, লবণ আইন ভঙ্গের মাধ্যমে ডাণ্ডি-সত্যাগ্রহে, লণ্ডনে গোল-টেবিল বৈঠকে, বুনিয়াদী শিক্ষা-বিস্তারে ও অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণে, ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে এবং ১৯৪৬-৪৭-এ দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালী ও বিহার পরিক্রমায় তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী আততায়ীর গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়।]

॥ অনুশীলনী ॥

১। "মেয়েটা ভীষণ সাহসী।"

—মেয়েটা বলতে কা'কে বোঝান হয়েছে? সে সত্যই সাহসী কিনা, বুঝিয়ে বলো।

২। 'ভূত-দেখা ছেলে'টি আসলে কে? তার ভূতের ভয় সম্পর্কে কী জানো? অন্য দু'-একটি ব্যাপারে তার ভীতু স্বভাবের কথা বলো।

৩। 'ভূত-দেখা ছেলে'টির মাংস খেয়ে কী বিপদ হয়েছিল? ছেলেটি আর কী নিষিদ্ধ জিনিস খেয়েছিল?

৪। 'ভূত-দেখা ছেলে'টি আত্মহত্যা করতে গেল কেন? শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল, জানাও।

৫। "বাবা শাস্তি দিতে পারলেন না।"

—কা'কে শাস্তি দেয়া সম্পর্কে এ-কথা বলা হয়েছে? সে কী অন্যায় করেছিল? কেন বাবা তাকে শাস্তি দিতে পারলেন না?

৬। গান্ধীজী কা'র পরামর্শে এবং কবে থেকে রাম নাম করতে শুরু করেন? কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়?

৭। কোন্‌টি শুদ্ধ আর কোন্‌টি অশুদ্ধ বলো। শুদ্ধর পাশে ✓ ও অশুদ্ধর পাশে × চিহ্ন দাও।

(ক) একদিন ঠিক করে সে, গল্প করে কাটিয়ে দেওয়া যাক রাতটা।

(খ) মনে হয়, ওর পেটের মধ্যে একটা পাঁঠা কেবলই চেঁচাচ্ছে।

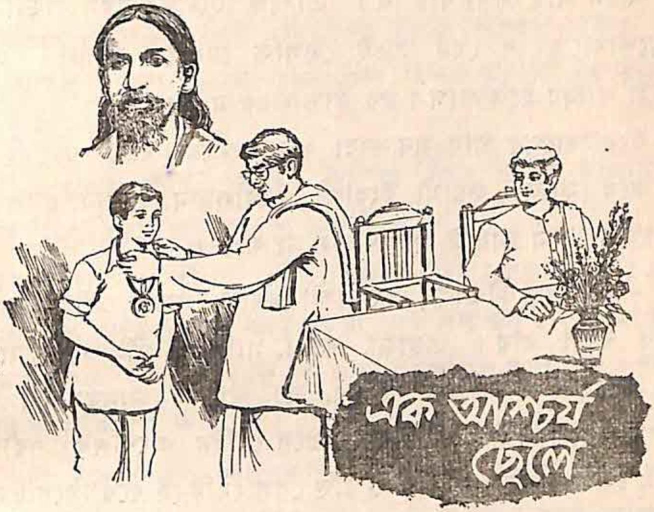
৮। মৌখিক প্রশ্নাবলী :—

(ক) 'ভূত-দেখা ছেলে'র পুরো নামটি কী? কেন তিনি বিখ্যাত?

(খ) মহাত্মা গান্ধীকে কে হত্যা করে? মৃত্যুর মুহূর্তে তিনি কী বলেন?

(গ) গান্ধীজীর ছেলেবেলার যে-কোনো একটি মজার কাহিনী বলো।

(ঘ) 'ভূত দেখা ছেলে'র কাহিনীটি পড়ে গান্ধীজীর ছেলেবেলা সম্পর্কে তোমার কী ধারণা হয়?



ছেলেটা কথা বলে কম, ভাবে বেশি ; খেলে কদাচিৎ, পড়ে সারাক্ষণ।

—কী পড়া পড়িস রে তুই !—ক্লাশের ছেলেরা ফোঁড়ন কাটে।

সেণ্ট্ পল্স্ স্কুলের মাস্টারমশাইরাও প্রায় একই কথা বলেন।

ওদিকে হেডমাস্টারমশাই শাসিয়ে ওঠেন একদিন। সারা স্কুলকে ধমক দিয়ে বলেন,—চোপরও ! যত সব হাড়বজ্জাত শয়তানের দল ! ছেলেটাকে দেখেও শিখিস নে ? বুঝিস নে যে ও তোদের চেয়ে কত ভালো ?

আসলে ছেলেটি পড়ার বই পড়ত যত, বাইরের বই পড়ত তার অনেকগুণ। পড়ত, বুঝত এবং ভাবত। তেরো বছরের ছেলের বিদ্যেবুদ্ধি দেখে অবাক হত সবাই। সবাই বলত, একই সঙ্গে

ইংরেজী, ল্যাটিন আর গ্রীক ভাষায় এমন তুখোড় ছেলে লণ্ডন শহরে এর আগে আর দেখা যায় নি। এদিকে ছেলেটির বয়স বাড়ল যত, পড়াশোনাতে সে যেন ততই ভেলকি দেখাতে লাগল। ততই সকলে তাজ্জব হতে লাগল ওর কাণ্ডকারখানা দেখে।

ইয়োরোপের প্রায় সব ভাষা মাত্র পনেরো বছর বয়সেই সে রপ্ত করে ফেলল। ফরাসী, ইংরাজী, ইতালিয়ান, জার্মান, রাশিয়ান, স্প্যানিশ কোন ভাষাই বাদ থাকল না আর।

—আর শুধু কী ভাষা! হেডমাস্টারমশাই বললেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানেও অদ্ভুত দখল তার। এছাড়া, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন—কোনোটাই বাদ নেই।— ও যে এমন করবে, তা আগেই জানতুম—বললেন স্কুলের সেক্রেটারী! ১৪ বছর বয়সে যেদিন প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হল ও, যেদিন ৪৫ পাউণ্ড বৃত্তি পেল সেদিনই ধরে নিয়েছিলাম, যে-সে ছেলে ও নয়।

ও আবার কবিতা লেখে,—সেণ্ট পল্‌স স্কুলে খবর এল একদিন। খবর শুনে হেডমাস্টারমশাই বললেন, ভালো কথা। কবিকে তবে কাজে লাগান যাক। স্কুলের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় কবিতা আবৃত্তি করুক সে।

শোনা যায়, শেষ পর্যন্ত আবৃত্তি সে করে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর 'কোকিলের প্রতি' কবিতাটি শুনিয়ে মুগ্ধ করে দেয় সবাইকে।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, সোনার মেডেল দাও ওকে। সবচেয়ে সেরা মেডেলটা ওর গলায় ঝুলিয়ে দাও।

শেষ পর্যন্ত তাই দেওয়া হল। ছেলেটি ঘরে ফিরল বিজয়ী বীরের মতো। মুগ্ধ শ্রোতারা বলাবলি করছিল তখনও, চমৎকার!

চমৎকার আবৃত্তি করেছে ছেলেটি। ওর কণ্ঠ যেমন দরাজ, উচ্চারণ তেমনি স্পষ্ট। ওকে আরও কয়েকটা মেডেল দিলে ঠিক হত।

ওদিকে ছেলেটির কিন্তু মেডেলের দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ঘরে ফিরেই কবিতা লিখতে বসল এবং লিখল আশ্চর্য এক কবিতা 'কোকিলের উদ্দেশে'।

সেই থেকে আরও অনেক কবিতা লিখল ও এবং ইংল্যাণ্ডের অনেক পত্রপত্রিকায় ওর কবিতা প্রকাশিত হল।

কিন্তু হলে হবে কী। কবিটি কিন্তু খ্যাতির তোয়াক্কা করে না। ১৮৮৯ সালে মাত্র সতের বছর বয়সে আর দশ জন ছাত্রের মতোই লণ্ডনের কিংস কলেজে ভর্তি হয় ও। কেমব্রিজ ক্ল্যাসিক্স্ পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হতে থাকে।

তৈরী নিশ্চয় খুব ভালোভাবে হয়েছিল। তা না হলে ১৮৯২ সালের এক সকালে সংবাদপত্র হাতে নিয়ে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা চমকে উঠবে কেন ? কেন ওরা অবাক হবে শুনে যে একজন বিদেশী ছাত্র ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাইপোজ পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছে ?

—কী অদ্ভুত ওই বিদেশী ছাত্র! কী আছে ওর মাথায়! কৌতূহল প্রকাশ করলেন অনেকেই।

পরীক্ষকদের একজন, অস্কার ব্রাউনিঙ্, বললেন, ওর মাথায় কী আছে জানি নে। তবে খাতায় যে মূল্যবান সব জিনিস আছে তা হলপ করে বলতে পারি। কেননা, তেরো বছর ধরে ট্রাইপোজ পরীক্ষার খাতা দেখছি আমি; কিন্তু এমন খাতা আর একটিও দেখিনি।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে যখন বি-এ পাশ করল ছেলেটি, তখনও ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় পরীক্ষকদের ঠিক এই একই কথা বলতে শোনা গেল, এমন খাতা আর একটিও দেখিনি।

এদিকে ছেলেটির শুভাকাঙ্ক্ষীরা পরামর্শ দিল, তুমি এবার ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দাও।

পরীক্ষা দেবার ইচ্ছে ছেলেটির আদৌ ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের এবং বিশেষ করে পিতার আগ্রহে পরীক্ষা ওকে দিতে হল।

আই-সি-এস্-এও বেশ ভালোই করল ও। মাত্র ১৮ বছরের ছেলে খুব ভালো নম্বরই পেল। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষার দিন এক বিপদ। পরীক্ষার সময় পেরিয়ে যায়, ছেলেটি আর আসে না।

—কোথায় সে?—পরীক্ষকরা এ ওর মুখের দিকে তাকান,—সে ছেলেটি কোথায়?

ছেলেটি তখন তাস খেলছিল। মাথা ঘামাচ্ছিল চিড়িতন হরতন নিয়ে।

—পরীক্ষা দেবে না? বন্ধুদের একজন তাড়া দিল ওকে।

ও সংক্ষেপে জবাব দিল, দেবো।

—দেবে তো যাও।

—এই যাচ্ছি, সামনের দানটা হয়ে গেলেই....

দেখতে দেখতে সামনের দান এবং তার পরের দানও হয়ে যায়, কিন্তু ছেলেটি যাবার নাম করে না!

শেষ অবধি অবিশ্যি পরীক্ষা দিতে যায় সে; কিন্তু অনেক

দেরীতে যায়। পরীক্ষকরা ততক্ষণে পাততাড়ি গুটিয়ে বাড়ি চলে গেছেন।

ব্যাপার দেখে ছেলেটির বন্ধুরা থ। ওরা বার বার একই প্রশ্ন করে,—কী লাভ হল তোর দেরী করে গিয়ে?

ছেলেটি জবাব দিল, লাভ অনেক। সবচেয়ে বড় লাভ, আমাকে আই-সি-এস্ হতে হল না। দাসখৎ লিখে দিতে হল না ব্রিটিশ প্রভুদের কাছে।

শোনা যায়, পরের বছরও ছেলেটিকে ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা দেবার জন্যে ডাকা হয়। কিন্তু ছেলেটি সেই ডাকে সাড়া দেয়নি।

কী করে দেবে? তখন ভারত-উদ্ধারের কথা ভাবছে সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের কাছে অগ্নিগর্ভী বক্তৃতা দিচ্ছে।

—কে এই ছেলে? বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রে, দেশপ্রেমে মহান এই ছেলেটি কে?—বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকে বলাবলি করল।

—চেনো না ওকে? বললো কেউ কেউ, ও হল শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ!

●

[**জীবন-কথা:** বিপ্লব-আন্দোলনের অগ্রদূত যোগী ও দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ এ-যুগের এক বিস্ময়। জন্ম ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায়। তাঁর সাত বৎসর বয়সে পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ তাঁকে এবং তাঁর দুই ভাইকে পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের জন্যে ইংল্যাণ্ডে এক ইংরেজ পরিবারে রাখেন। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় প্রথম হয়ে অরবিন্দ সিভিল সার্ভিস পাশ করেন। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় গরহাজির থাকায় শেষ পর্যন্ত তিনি চাকরীতে যাননি। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ট্রাইপস' পাশ করে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি দেশে ফেরেন। এরপর ধীরে ধীরে স্বদেশের বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে আলিপুর বোমার মামলায় তাঁর বিচার হয়। বোমার মামলা থেকে মুক্ত হবার কিছুকাল পর অন্তরের নির্দেশে তিনি রাজনীতি ত্যাগ করেন এবং পণ্ডিচেরী গিয়ে যোগ-সাধনায় মগ্ন হন। ওদিকে ফ্রান্স থেকে শ্রীমা মীরা (মাদাম পল রিশার) এসে তাঁর সঙ্গে অধ্যাত্ম-সাধনায় যোগদান করেন। চৈতন্যের বিকাশ ঘটিয়ে দিব্য জীবনে উন্নীত হওয়াই শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনার মূল লক্ষ্য। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।]

॥ অনুশীলনী ॥

১। 'আশ্চর্য ছেলে'টি কে? কেন ওর কাণ্ডকীর্তি দেখে সবাই অবাক হ'ত? পরীক্ষায় ওর কীর্তির কথা কিছু জানো?

২। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রে, দেশপ্রেমে—আশ্চর্য্য ছেলে'টি সব দিক দিয়েই যে বড় ছিল, একটি করে উদাহরণ দিয়ে তা বোঝাও।

৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) ছেলেটা — বলে কম ; — বেশি।

(খ) কেমব্রিজ --- — দেবার জন্য তৈরী হতে থাকে।

(গ) কিন্তু — — পরীক্ষার দিন এক বিপদ।

৪। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) :—

(ক) শ্রীঅরবিন্দ কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

(খ) পণ্ডিচেরী কেন বিখ্যাত?

———



এক ছিল মেয়ে! বেশ সুশ্রী দেখতে। তার বাবা কৃষ্ণস্বামী আয়ার ; মাদ্রাজে সরকারী অফিসে বড় কাজ করেন। মা সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন ঘরগেরস্থালীর কাজে।

বাবা-মা দুজনেই চিন্তিত। মেয়ে বড় হচ্ছে। ভালো পাত্র দেখে বিয়ে দেয়া দরকার।

কিন্তু পাত্র কোথায়? মনের মতো ছেলে কই?···বাবা মা কা'রও চোখেই পছন্দসই কেউ পড়ে না।

একদিন। মায়ের মনে ধরল একটি ছেলেকে।

চমৎকার ছেলে। স্বভাব-চরিত্রে যেমন, লেখাপড়ায়ও তেমনি।

কিন্তু বাবা বেঁকে দাঁড়ালেন। স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলেন একদিন,—না না। ও ছেলের সঙ্গে বিয়ে কিছুতেই হবে না। ও একে গরীব, তায় আবার বংশে খাটো।

মা অনেক করে বোঝাতে চাইলেন,—কিন্তু ছেলে তো ভালো ! বাবা কৃষ্ণস্বামী বুঝলেন না কিছুতেই। বললেন,—অমন ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দেয়ার চেয়ে জলে ভাসিয়ে দেয়া ভালো।

মেয়ের কানে গেল কথাটা ; এবং যেতেই সোজা জানিয়ে দিল, —ও ছেলেকেই আমি বিয়ে করবো।

—সে কী ?—বাবা আকাশ থেকে পড়লেন,—সমাজে আমি মুখ দেখাবো কেমন করে ? অমন নীচু ঘরের ছেলেকে জামাই করলে সবাই মিলে যে আমায় একঘরে করবে !

—করে তো করুক ? মেয়ের হয়ে মা জবাব দিলেন এবার,— মেয়ের যেখানে পছন্দ, সমাজের ভয়ে আমি সেখানে পিছিয়ে যেতে নারাজ।

মা এবং মেয়েরই জয় হল শেষ অবধি। নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু এ বিয়ের জন্যে মেয়েটা এমন জেদ ধরেছিল কেন ? কেন এমন ক্ষেপে উঠেছিল ?

শোনা যায়, ছেলেটি যে অদ্ভুত রকম প্রতিভাবান, একথা আগেই নাকি তার কানে আসে। ছেলেটি সম্পর্কে আশ্চর্য সব কথা সে নাকি অনেক আগেই লোকমুখে শোনে।

লোকের অবিশ্যি দোষ নেই। ওরা খাঁটি কথাই বলতো ; যা ঘটেছে, হুবহু তাই। ঘটনাগুলোর দু-একটা এখানে বলি।—

ছেলেটার বয়স তখন পনেরো। সোনার মেডেল আর ফার্স্ট-ক্লাশ নিয়ে সবে বি-এ পাশ করেছে। পদার্থ বিজ্ঞানে এম-এ পড়ছে।

বিজ্ঞান নিয়ে নতুন নতুন পরীক্ষা করবে বলে সারাক্ষণ সে অস্থির। কিন্তু পরীক্ষার সুযোগ আর আসে না।

একদিন। হঠাৎ করেই সুযোগ এল।

ছেলেটির এক বন্ধু এবং সহপাঠী ভি আপ্পারাও এসে বললেন,—ভাই, বড় বিপদ। সেদিন শব্দবিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষা করছিলুম। দেখি, উল্টোপাল্টা সব তথ্য। কী করি, বলতো ?

ছেলেটি বললে,—অধ্যাপক জোন্স্‌কে জানাও।

—জানিয়েছি।

—কী বললেন তিনি ?

—কিছু না। মনে হল, জোন্স্‌ বিষয়টা ঠিক ধরতে পারেন নি।

—জোন্স্‌ পারেন নি, আর আমি পারবো ? আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি।

দেখল ছেলেটা। প্রচণ্ড উৎসাহে পরীক্ষা সুরু করল এবং দিন-কয়েকের মধ্যেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুল যে, শব্দবিজ্ঞান শাস্ত্রের বিশেষ একটি শাখায় নতুন কিছু সে আবিষ্কার করেছে।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে এই আবিষ্কারের কথা শুনে দারুণ খুশি। চিঠি লিখে ছেলেটিকে উৎসাহ দিলেন তিনি।

ছেলেটি ততক্ষণে তার আবিষ্কারের বিষয়টা গুছিয়ে লিখে ফেলেছে। অধ্যাপক জোন্স্‌কে দিয়েছে দেখতে।

কিন্তু জোন্স্‌-এর সময় কোথায় ! এক মাস, দু'মাস, তিন মাস পেরিয়ে গেল ; লেখাটা না দেখে তিনি ফেলে রাখলেন।

এদিকে তরুণ বিজ্ঞানীর আর তর সয় না। একদিন অধ্যাপককে সে বললো,—স্যার, লেখাটি একটু দেবেন ?

—কেন ?

—দু'একটা জায়গা অদলবদল করবো একটু।

—বেশ, নাও।

লেখাটা পেয়ে ছেলেটি নিশ্চিন্ত। কারণ, অদলবদলের কথাটা

আসলে অজুহাত। একযুগ পড়ে থাকলেও অধ্যাপক লেখাটা পড়বেন না, মূল্যবান জিনিসটা হারিয়ে ফেলবেন বরং, এই ভয়ে ছেলেটি ওটা ফিরে-পাবার ফিকির খুঁজছিল।

লেখাটাকে পেয়েই সে সোজা পাঠিয়ে দিল লণ্ডনের এক নামকরা বিজ্ঞান পত্রিকা 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ। অধ্যাপক জোন্স্ ব্যাপারটার কিছুই জানলেন না।

এদিকে দিনকয়েক বাদে ছাপা হয়ে গেল লেখাটা। ছেলেটি বিস্ময়ে আর আনন্দে নেচে উঠল। অধ্যাপক জোন্স্‌কে পড়তেও দিল একবার।

জোন্স্ ব্যাপার দেখে থ ;—লেখাটা পাঠাবার আগে দেখাও নি কেন ?—রাগে আর বিরক্তিতে গর্জন করে উঠলেন তিনি।

ছেলেটি সবিনয়ে বললো,—দেখিয়ছিলুম স্যার। লেখাটা অনেক-দিন আপনার কাছে ছিল।

—ছিল ?

—হ্যাঁ স্যার, ভাবলুম বুঝি আপনি ওটা দেখেছেন। কোনো কিছু সংশোধনের দরকার মনে করেন নি হয়তো।

—করি নি, তোমায় কে বললো ?

—না স্যার, কেউ বলে নি।

—তবে ?

—ক্ষমা করুন স্যার! আমি দুঃখিত।

অধ্যাপক জোন্স্ শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করলেন কিনা, ঠিক বোঝা গেল না।

এদিকে ছেলেটি কিন্তু বসে নেই। কিছুদিনের মধ্যেই দৃষ্টিবিজ্ঞানের ওপর তার নতুন আবিষ্কার ও গবেষণা সম্পর্কে আর একটি প্রবন্ধ

লিখে লণ্ডনে পাঠাল। তার এবারকার লক্ষ্য ছিল আর একটি বিখ্যাত বিজ্ঞান-পত্রিকা 'নেইচ্যার'।

এবারও ছাপা হল লেখাটি এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে এ নিয়ে রীতিমত সাড়াও পড়ল। কারণ, এর আগে এত অল্প বয়সে বিদেশের এমন নামজাদা কাগজে কেউ কোনদিন প্রবন্ধ লেখে নি।

আর শুধু কি প্রবন্ধ! কেউ কি কখনও শুনেছে, বয়স আঠারো পেরোবার আগেই প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে পদার্থবিজ্ঞানে এম-এ পাশ করেছে কোনো তরুণ?

ছেলেটি কিন্তু এম্-এ পরীক্ষাতেই শুধু নয়, সর্বভারতীয় একটি পরীক্ষাতেও প্রথম হল। পরীক্ষাটি ছিল 'অল-ইণ্ডিয়া ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট'-এর।

মাত্র আঠারো বছর বয়সে 'ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল'-এর কাজ পেল ছেলেটি।

কিন্তু বয়স কম আর দেখতে ছোটখাটো বলে কত অসুবিধেই না তাকে সহ্য করতে হয়েছে!

একবার। ছেলেটি তখন বি-এ ক্লাসের ছাত্র। অধ্যাপক ইলিয়ট ইংরেজী কবিতা পড়াতে এসে ওকে শুধোলেন,—সত্যি কি তুমি বি-এ ক্লাশে পড়?

—হ্যাঁ স্যার, পড়ি :—ভয়ে লজ্জায় জবুথবু হয়ে ও জবাব দিলে।

—তোমার বয়স কত?

—তেরো!

—নাম?

—সি. ভি. রমন।

[**জীবন-কথা :** চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ পদার্থ-বিজ্ঞানী। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনোপল্লী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল ও কলেজ জীবনের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে অধ্যাপক হয়ে কলকাতায় আসেন। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই শহরে ছিলেন। পরে বাঙ্গালোরে 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিট্যুট অব্ সায়ান্স্'-এর ডিরেক্টর হন। পদার্থ-বিজ্ঞানে মৌলিক আবিষ্কারের জন্যে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। তিনিই প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী যিনি এই পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেন। সম্প্রতি আর একজন ভারতীয় বংশোদ্ভব বিজ্ঞানী ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।]

॥ অনুশীলনী ॥

১। "বাবা-মা দু'জনেই চিন্তিত।"

—কেন ওঁরা 'চিন্তিত' ছিলেন? 'বাবা' কোথায় কাজ করতেন? মা সারাক্ষণ কী কাজে ব্যস্ত থাকতেন?

২। "একদিন মায়ের মনে ধরল একটি ছেলেকে।"

—ছেলেটিকে মায়ের মনে ধরেছিল কেন? কেনই বা 'বাবা' বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন?

৩। "মা এবং মেয়েরই জয় হল শেষ অবধি।"

—এখানে কেন 'জয়'-এর কথা বলা হয়েছে? কী কী কথা কাটাকাটির পর এই জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল?

৪। "হঠাৎ করেই সুযোগ এল"।

—কা'র কোন্ সুযোগের কথা এখানে বলা হয়েছে? কেমন করে তা এসেছিল, বুঝিয়ে বলো।

৫। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে সাড়া পড়েছিল কেন?

৬। 'বর ছিলেন বিজ্ঞানী' লেখাটি পড়ে বলো, বরের নাম কি ?

—তিনি যে বিজ্ঞানী ছিলেন পাঠ্য লেখাটি থেকে তার কী প্রমাণ মেলে ?

৭। লর্ড র‍্যালে কে ছিলেন ? তিনি সি. ভি. রমন-এর ওপর খুশি হয়েছিলেন কেন ?

৮। কোন্‌টি শুদ্ধ ও কোন্‌টি অশুদ্ধ বলো। শুদ্ধর পাশে √ ও অশুদ্ধর পাশে × চিহ্ন দাও :—

(ক) মাত্র আঠারো বছর বয়সে 'ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট জেনারেল'-এর কাজ পেল ছেলেটি।

(খ) মা সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন লেখাপড়ার কাজে।

(গ) এবা'রও ফেরৎ এলো লেখাটি।

৯। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) :—

(ক) বিজ্ঞানী কা'কে বলে ? আমাদের দেশের যে-কোনো দুজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর নাম বলো।

(খ) 'বর ছিলেন বিজ্ঞানী'-তে যে বিজ্ঞানীর কথা বলা হয়েছে তার পুরো নাম কী ? কোন্ পুরস্কার পেয়ে তিনি পৃথিবী-বিখ্যাত হন ?

(গ) সি. ভি. রমন এম. এ. পরীক্ষায় কীরূপ ফল করেছিলেন ? তখন তাঁর বয়স কত ?

———



মাস্টারমশাই শাসিয়ে উঠলেন,—কী হয়েছে এসব ?

র‍্যাভেন্‌স কলেজিয়েট স্কুলের ফোর্থ ক্লাশের ছেলেরা ঢোক গিলল বার কয়েক, এবং তারপর ছেলেদেরই মধ্যে দুঃসাহসী একজন জানতে চাইল, কী হয়েছে স্যার ?

স্যার বললেন, নতুন একটা গরুর জন্ম ।

—গরু !—দুঃসাহসী ছেলেটি যেন আকাশ থেকে পড়ে ।

মাস্টারমশাই বুঝিয়ে দেন,—হ্যাঁ, গরু ! আর সে নতুন জীবটি হচ্ছ তুমি ।

—আমি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি । গরু না হলে কেউ কি এমন কীর্তি করে ? তোমার মতো অমন ঝরঝরে বাংলা লেখে ?

ক্লাশে এইবার চাপা হাসি শোনা যায়। সহপাঠীদের কেউ কেউ পরামর্শ দেয় ছেলেটিকে, অ্যাই! বসে পড়।

এদিকে মাস্টারমশাই তখনও থামেন নি। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলে চলেছেন, রচনা লিখতে দিলুম গরু নিয়ে; কিন্তু তুমি যা লিখেছ বাবা, তা পড়ে মনে হল, তুমি নিজেই একটা গরু। আস্ত গরু।

ছেলেটি কোনো জবাব দেয় না এসব কথার। মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওদিকে ক্লাসে অট্টহাসি সুরু হয়েছে এতক্ষণে আর মাস্টারমশাই হাসির রসদ যোগাচ্ছেন,—গরুর লেখা বিষয়ক রচনাটি পড়ে মনে হল, একটিও শুদ্ধ বাক্য নেই ওতে, শুদ্ধ বানান বলতে গেলে ওতে একটিও নেই। শুনবে তোমরা? শুনবে সেই রচনাটি?

ক্লাশ-ভর্তি ছেলে একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল, শুনবো স্যার! শুনবো!

—শোন তবে,—মাস্টারমশাই রসিয়ে রসিয়ে রচনাটি পড়তে লাগলেন এবার, ছেলেদের শোনাতে লাগলেন।

ক্লাসে হাসির ধুম পড়ল সঙ্গে সঙ্গে; আর গরু উপাধি পাওয়া ওই ছেলেটির মনে হল, ধরণী দ্বিধা হও! লজ্জায় অপমানে আমি এবার সীতার মতো পাতালে প্রবেশ করি।

কিন্তু ধরণী দ্বিধা হল না। পাতালেও প্রবেশ করতে হল না ছেলেটিকে। চেষ্টায়, শুধু মাত্র নিজের চেষ্টায় কয়েক মাসের মধ্যেই এ অপমানের প্রতিশোধ সে নিল। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেল, বাংলায় সে-ই সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে।

—এত নম্বর কী করে পেলি তুই? স্কুলে ভর্তি হবার আগে

তুই তো এক বর্ণও বাংলা পড়িসনি! বাংলায় কী করে তুই প্রথম হলি?—ক্লাশের ছেলেরা ওকে ঘিরে ধরে অসংখ্য প্রশ্ন করে।

ও জবাব দেয়,—তা বটে! ফোর্থ ক্লাশে ওঠবার আগে অর্থাৎ এই স্কুলে আসবার আগে বাংলা আমি এক বর্ণও পড়িনি।

আসলে সব বিষয়েই ছেলেটি ভালো। বাংলায় ও নাজেহাল হয়েছিল, তেরো বছরে পা দেবার আগে কোনদিন সে ভাষাটা শেখেনি বলে।

এদিকে দেখতে দেখতে সে আর একটা ভাষা শিখে ফেলল; এবং সে ভাষাটা শিখল প্রকৃতির কাছ থেকে।

প্রকৃতিকে সত্যি ভালবাসল ও। বন-পাহাড়কে মনে মনে পূজো করতে শুরু করল। আর শুধুই কি বন-পাহাড়! কলকল খলখল করে ছুটে-চলা নদীর ধারে হামেশাই ছুটে যেত ও। কখনও যেত নির্জন কোনো মাঠে।

মাঠে গিয়ে ভালো একটা জায়গা বেছে নিত; ধ্যানে বসত।

সূর্য অস্ত যেত পশ্চিম দিগন্তে। ওর হুঁস থাকত না।

স্কুলের প্রধান শিক্ষকমশাই উৎসাহ দিতেন, এই তো চাই। প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দাও। দেখবে, জীবন সুন্দর হয়ে উঠেছে।

জীবন সত্যি সুন্দর হয়ে উঠল ছেলেটির। প্রকৃতিকে ভালোবেসে তার মনের একাগ্রতা বাড়ল।

কিন্তু মন যেন আরও কত কী চায়! কিছুতেই যেন তার ক্ষিধে মেটে না।

ভাবতে ভাবতেই একদিন মনের সত্যিকারের খোরাক সে পেয়ে যায়।

স্বামী বিবেকানন্দের কিছু বই পড়ে সে জানতে পারে, মনের খোরাক

মেলে মানুষের সেবা করে। এই সেবা থেকেই আসে মুক্তি এবং এই মুক্তিই হল জীবনের আদর্শ।

হ্যাঁ, আদর্শের সন্ধান এতদিনে পেল ছেলেটি। পনেরো বছর বয়স হতে না হতেই তার ভাবনার আঁধার-জগতে হঠাৎ যেন আলোক জ্বলে উঠল।

এরপর কয়েক দিনের মধ্যেই সে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের একদল ভক্ত জুটিয়ে ফেলল; এবং ভক্তদের নিয়ে সুরু করল আলাপ-আলোচনা। আলোচনা স্কুলে হ'ত কখনও, কখনও বা স্কুলের বাইরে।

বাইরে বলতে দূরে—স্কুল এবং বাড়ি থেকে অনেক দূরে কোনো জায়গায়!

— এত দূরে আসি কেন আমরা?—ভক্তদের কেউ কেউ জানতে চায়।

ছেলেটি বুঝিয়ে দেয়,—দূরে আসি আলোচনার সুবিধে হবে বলে।

মিথ্যে নয় কথাটা। দূরে গিয়ে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের আদর্শ নিয়ে আলোচনার সুবিধে হল বটে; কিন্তু অসুবিধে দেখা দিল ঘরে।

ঘরে মা-বাবা টের পেয়ে গেলেন, ছেলেটা প্রায়ই যেন কোথায় যায়।

—কোথায় যাস রে তুই? মা শুধোন।

—কাল সারাদিন তোর পাত্তা মেলে নি কেন? বাবা জানতে চান।

ছেলেটা কোনো জবাব দেয় না এসব কথার; চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

মা-বাবা অনেক করে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেন প্রথমটায়। কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হয় না, তখন বকুনি দেন।

বকুনিতেও এতটুকু যদি কাজ হত! এতটুকুও যদি শোধরাত ছেলেটা।

শোধরাবে কী করে! তার মাথায় তখন যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ ঘুরছে। সে ভাবছে, কী করে সেই আদর্শকে সফল করে তুলবে জীবনে। ভাবছে, কী করে লোভ এবং প্রবৃত্তিকে দমন করে সংসারের বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ করে জনসেবার মধ্যে বিলিয়ে দেবে নিজেকে।

কিন্তু বিলিয়ে দেওয়া কি এত সহজ? একজন কি ইচ্ছে করলেই অনেকজনের হয়ে উঠতে পারে?—ছেলেটি প্রশ্ন করে নিজেকেই।

প্রশ্ন করে, কিন্তু জবাব পায় না।

অগত্যা যোগ-অভ্যাস শুরু করে সে। সুযোগ পেলেই ধ্যানে বসে। খবর পেলেই ছোটে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে।

দেখতে দেখতে কত রকম সন্ন্যাসীর সঙ্গে যে যোগাযোগ হয় তার! মুক্তি নিয়ে কত যে চিন্তা তাকে ঘিরে ধরে।

অবশেষে একদিন; চিন্তার হাত থেকে রেহাই পায় সে। বুঝতে পারে, দরিদ্রের মধ্যে আছেন ভগবান, আছে মুক্তি। অতএব ভগবানকে পেতে হলে দরিদ্রের সেবা করতে হবে, জনসেবায় এগিয়ে যেতে হবে।

ছেলেটা এগোল ঠিক। ষোল বছর বয়স হতে না হতেই দেশের কাজ করবে বলে দলবল নিয়ে এক গ্রামে গিয়ে হাজির হল, এবং

গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতাও করল কিছুদিন। কিন্তু র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকদের ওদিকে মাথায় হাত।

বার বার বলাবলি করলেন ওঁরা,—ভেবেছিলাম, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছেলেটা ভালো কিছু করবে। কিন্তু এখন দেখছি, ওকে দিয়ে কিছু হবে না।

—হবে কী করে!—ফোঁড়ন কাটলেন কেউ কেউ,—দিনরাত্রি সাধু-সন্ন্যেসী আর জনসেবা নিয়ে মাতলে কি আর পরীক্ষা হয়!

কিন্তু ওদিকে যা হবার তা হয়ে গেল। প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেল, ওই খামখেয়ালী ছেলেটাই হাজার হাজার ছেলের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

—স্থানটা আরও ভালো করতে পারো না? ইচ্ছে করলেই প্রথম হতে পারো না তুমি? কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময় অধ্যাপকরা শুধোন।

ছেলেটি কোনো জবাব দেয় না। ভাবে, পরীক্ষাটাই কি জীবনের সব? না কি আরও কিছু উদ্দেশ্য আছে তার?

উদ্দেশ্য আরও কিছু আছে নিশ্চয়, ছেলেটির ধারণা জন্মে এক-একবার,—নিশ্চয় জনসেবার মধ্য দিয়েই দেশের উন্নতি সম্ভব, আত্মার উন্নতি সম্ভব, ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করা সম্ভব।

এবার জনসেবার আদর্শে মেতে উঠল ছেলেটি। আনথ-ভাণ্ডারের জন্য প্রতি রবিবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল-ডাল সংগ্রহ করল। কলেজে যাতায়াতের ট্রাম-ভাড়া বাঁচিয়ে ভিক্ষুককে দান করল, নিজের জীবন বিপন্ন করে গ্রামে গিয়ে কলেরা রুগীর সেবা করল।

কে এই ছেলে? চিন্তায়-ভাবনায়, মায়ায়-মমতায়, স্বভাবে চরিত্রে সব দিক দিয়ে বড় এই ছেলেটি কে?

লোকে বলত, ছেলে তো নয়। ও হল আগুন, পরশমণি ও। যাকে ছোঁয় তাকেই সোনা করে।

এ-কথা সারা পৃথিবী মেনে নিল একদিন! বললো—হ্যাঁ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আগুনের পরশমণিই বটে!

[**জীবন-কথা ঃ** সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমের জন্য সুভাষচন্দ্রের নাম এদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। 'নেতাজী' নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। জন্ম ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে, ওড়িষার কটক শহরে। পিতা জানকীনাথ বসু ও মাতা প্রভাবতী-দেবী। ছাত্রজীবনে কটকের র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক বেণীমাধব দাস সুভাসচন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন। কটক থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে তিনি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। ঐ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা-ধারা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বিলেতে যান; ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে আই. সি. এস. হন। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস-এ তিনি যোগ দেননি কেমব্রিজ থেকে দর্শনে ট্রাইপস্ পাশ করে কলকাতায় ফিরলেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে দেশের কাজে যোগ দিলেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্যে ইংরেজ সরকার বহুবার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। কিছুকাল তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন। পরে মতবিরোধ হওয়ায় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন। জাপানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ-এরও পতন ঘটে; কিন্তু একথাও ঠিক যে ভারতের মাটিতে তিনিই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে-ছিলেন। তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে নানান রহস্য পুঞ্জীভূত; যদিও জনগণমন অধিনায়ক নেতাজীর মৃত্যু নেই; তিনি চিরঞ্জীব।]

॥ অনুশীলনী ॥

১। 'গরু না হলে কেউ কি এমন কীর্তি করে' ?—কে কা'কে একথা বলেছিলেন ? কেন বলেছিলেন ? ঘটনাটি বলো।

২। 'সে আর একটা ভাষা শিখে ফেলল।'—কোন্ ভাষা ? কেমন করে শিখল ?

৩। নেতাজীর পুরো নাম কী ? কিশোর-জীবনে তাঁর জনসেবার কথা কিছু বলো।

৪। পরশমণি কে ? রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আদর্শে কেমন ক'রে ও সাড়া দিল ?

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) মুক্তিই হল—আদর্শ।

(খ) সেবা থেকেই আসে—।

(গ) দরিদ্রের মধ্যেই আছেন—, আছে—।

৬। প্রশ্নাবলী (মৌখিক) :—

(ক) পরশমণি বলতে কী বোঝায় ?

(খ) আই. এন্. এ. কী ? এর প্রতিষ্ঠাতা কে ?

(গ) সুভাষচন্দ্রের ছেলেবেলার গল্প কেন তোমার ভালো লাগে ?